সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি নং - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ।

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

বর্ষ : ৬৪
সংখ্যা : ৪৭-৪৮
বার : সোমবার

০৪ সেপ্টেম্বর- ২০২৩ ঈসায়ী
২০ ভাদ্র- ১৪৩০ বাংলা
১৮ সফর- ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
জনাব চৌধুরী মু'মিনুল ইসলাম

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে.এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	:	০১৭৬১৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	:	০১৯৩৩৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	:	০১৭১৬৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	:	০১৯৩৩৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	:	০১৯৩৩৩৫৫৯০১	টেলিফোন	:	০২-৭৫৪২৪৩৪

মূল্য : ২৫/- (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

weeklyarafat@gmail.com
jamiyat1946.bd@gmail.com
www.weeklyarafat.com
www.jamiyat.org.bd
Shaptahik Arafat

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس : العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة :

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة :

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير : أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা : (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০৩
- **আল কুরআনুল হাকীম :**
  - **পরিতৃপ্ত আত্মার গন্তব্য**
    আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৪
- **হাদীসে রাসূল ﷺ :**
  - **রাগ নিয়ন্ত্রণকারীই প্রকৃত বীর**
    আবূ তাহসীন মুহাম্মদ- ০৭
- **প্রবন্ধ :**
  - **মহান আল্লাহর গজবে ধ্বংসপ্রাপ্ত কতিপয় জাতির ইতিকথা**
    আবু সা'আদ ড. মো. ওসমান গনী- ১২
  - **ইসলামী শিক্ষা একটি প্রাসঙ্গিক ভাবনা**
    আবূ ফাইয়ায মুহাম্মদ গোলাম রহমান- ১৪
  - **মৃত্যুর বৃত্তান্ত**
    আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ১৮
  - **নফস : মানুষের আত্মশত্রু ও শয়তানের বন্ধু**
    মো. হারুনুর রশিদ- ২৩
- **আলোকিত জীবন :**
  - **মুহাম্মাদ ইসমা'ঈল সালাফী জীবন ও কর্ম**
    তানযীল আহমাদ- ২৬
- **ক্বাসাসুল ক্বুরআন :**
  - **সেদিন আবরাহার বাহিনী'র সঙ্গে কি ঘটেছিল!**
    গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ৩০
- **বিশুদ্ধ 'আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস** ৩৪
- **সমাজচিন্তা :**
  - **প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের সম্পর্ক কেমন চাই**
    মো. আরিফুর রহমান- ৩৬
- **কবিতা** ৩৮
- **জমঈয়ত সংবাদ** ৩৯
- **শুব্বান সংবাদ** ৪১
- **ফাতাওয়া ও মাসায়েল** ৪৩
- **প্রচ্ছদ রচনা** ৪৭

সম্পাদকীয়

আত্মভোলা মানুষকে পথ দেখাবে কে?

ক্ষণস্থায়ী এ জীবনে মানুষ নানাবিধ কর্মচাঞ্চল্যে শশব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এটাই যেন জীবনের বাস্তবতা। জীবনের প্রয়োজনে কর্ম করতে হবে, কিন্তু চাহিদা যখন অসংলগ্ন ও সীমাতিক্রম করে, তখনই কর্মজীবন হয়ে ওঠে বিষাদময়। এ জগতে সকলেই যেন বিত্ত-বৈভবের দাসত্বের শৃংখলে বন্দি হয়ে পড়েছে। সকলের প্রদক্ষিণ অর্থকে ঘিরে। যার যত বেশি অর্থ-বিত্ত তাকে ততো বেশি সফল বিবেচনা করা হয়। তার অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী থাকে। ঘরে কিংবা বাইরে, দেশে কিংবা বিদেশে সর্বত্রই বিত্তবান মানুষের মূল্যায়ন। আমাদের সমাজে যার অর্থবিত্ত আছে, তাকেই কেবল প্রাধান্য দেওয়া হয়– একান্ত দাম্পত্য জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে সর্বক্ষেত্রে তার প্রাধান্য। আর এ জন্য মানুষ কর্মকে দিবা-নিশির ব্রত করে নিয়েছে।

পক্ষান্তরে কর্মহীনতা কিংবা আলস্যও একদম কাম্য নয়। কর্মহীন মানুষকে সকলেই নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে। কর্মহীন মানুষ দারিদ্র্যের কশাঘাতে নিষ্পেষিত হয়। বন্ধুবান্ধব, প্রিয়জন সকলের কাছে সে অপাঙক্তেয়। সমাজের এই বাস্তবতা সকলেরই কমবেশি জানা। বিধায় কর্মহীনতা যেমন প্রত্যাশিত নয়, তেমনই অর্থ-সম্পদের নেশায় কর্মকে ধ্যান-জ্ঞান করাও বিবেকহীনতার নামান্তর।

কিন্তু সমাজের বাস্তবতা ভিন্ন! আজকাল মনুষ্যত্ব, বিবেক, বিদ্যা-বুদ্ধি, জ্ঞান-প্রজ্ঞা সবই অর্থের কাছে নতজানু। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা যেন আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে– বিবেক বিসর্জন দিয়ে হলেও অর্থ উপার্জন করো! আত্মসম্মান, আত্মমর্যাদাকে পিছনে ফেলে অর্থের দাসত্বে পরিণত হও। কেননা, অর্থই সকল কিছুর কেন্দ্রবিন্দু!

মানুষ নিজের স্বকীয়তা, ব্যক্তিত্ব, মনুষ্যত্ব সবকিছু হারিয়ে এক অজানা তিমিরে আবদ্ধ। আর বিবেকবান মানুষ নিঃস্ব হয়ে অসহায়ত্বের চাদরে নিজেকে আড়াল করে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছে। জাগ্রত বিবেক আজ বেদনাক্লিষ্ট। কুলহীন এক ধূসর মরুতে একবিন্দু জলের মতো কিংবা মহাসাগরের অথৈ ঢেউয়ে খড়কুটোর মতো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের বিবেক আজ ভাসমান।

এটা কি জীবন! এটাকে মনুষ্যত্ব বলে!, এটা কি বিবেক! এটা কি সভ্যতা! নাকি এটা এক নিষ্ঠুর বাস্তবতা? হায়! যদি এসব প্রশ্নের কোনো সদুত্তর পেতাম! কারো কাছে এসব প্রশ্নের জবাব আছে কি? কীভাবে সম্ভব? জগত চাকায় ঘূর্ণয়মান বিবেক-বুদ্ধি সবই যে নির্বিকার। এরূপ হাজারো প্রশ্ন সদা জাগ্রত মনে ভেসে ওঠে; কিন্তু নেই কোনো জবাব, নেই কোনো প্রতিকার, নিস্তব্ধ-নিষ্ঠুর বাস্তবতা এটাই।

যে বা যারা ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে অর্থের দাসত্বে নিজেকে শৃঙ্খলিত করেছে, তারা হয়তো আজ সমাজের সফল মানুষ, সকলের প্রিয়ভাজন, একান্ত আপনজন। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী এই জীবনে সার্থকতার ঢেকুর তুলে তারা কিছুটা পরিতৃপ্ত হলেও তাদের শেষ পরিণতি সুখকর নয়।

পক্ষান্তরে যে মানুষ নিজের স্বকীয়তা ও মনুষ্যত্ব বিসর্জন না দিয়ে দৃঢ়চিত্তে নিজেকে আগলে রাখতে পেরেছে, সেই তো মনুষ্যত্বের মুকুট পরা আদর্শ সাম্রাজ্যের সম্রাট। বাহ্যত সে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার আদর-স্নেহ, ভালোবাসা ও অধিকার হতে বঞ্চিত হলেও প্রকৃতঅর্থে সে তার প্রভুর নিকট সম্মানিত। দুনিয়াবাসী ও আপনজনের কাছে তার মূল্যায়ন যাই হোক না কেন, সময়ের ব্যবধানে সভ্যতা ও সাফল্য তার পদচম্বুন করবে। আর এটাই ইনসানিয়াতের দাবি; আশরাফুল মাখলুকাতের বৈশিষ্ট্য।

স্মর্তব্য যে, যারা মহান আল্লাহকে রব মেনে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে, তারা কখনো ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য বেশামাল হতে পারে না। তাকৃদীরের প্রতি প্রগাঢ় ঈমান তাকে দৃঢ়চেতা হতে উদ্বুদ্ধ করে। তার ধ্যান-ধারণা এবং কর্মচঞ্চলতা কেবল একটি অভিষ্ট লক্ষ্যে ঘুরপাক খায়। আর তা হলো– মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি।

তাই স্রষ্টার মনোনীত দীন ইসলাম মানুষকে নিয়ন্ত্রিত জীবন-যাপনে অভ্যস্থ করে। কখনো বেপরওয়া হতে দেয় না। শিক্ষা দেয় মনুষ্যত্ব ও পরোপকারের। নীতি ও আদর্শ প্রকৃত মুসলিমের ভূষণ। কিন্তু সে ইসলামের ধারক-বাহক ও প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিবর্গ যখন অর্থবিত্তের পিছনে প্রদক্ষিণ করে, তখন এই আত্মভোলা মানুষকে পথ দেখাবে কে? ❑

আল কুরআনুল হাকীম

পরিতৃপ্ত আত্মার গন্তব্য

–আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ*

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ○ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ○ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ○ وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾

শাব্দিক বিশ্লেষণ

يَا শব্দটি حرف النداء অর্থাৎ- আহ্বান সূচক অব্যয়। النَّفْسُ শব্দটি موصف-আর الْمُطْمَئِنَّةُ হলো صفات এখন সিফাত এবং মউসুফ মিলে হলো يَا حرف النداء-এর منادى শব্দ দু'টি যেহেতু ইসিম ও মুয়াননাস এবং শুরুতে ال রয়েছে। তাই নিদা ও মুনাদার মাঝখানে أَيَّتُهَا যুক্ত হয়েছে। অর্থ হচ্ছে- হে পরিতৃপ্ত আত্মা! ارْجِعِي শব্দটি واحد مؤنث امر حاضر معروف অর্থ- তুমি প্রত্যাবর্তন করো। إِلَىٰ رَبِّكِ অর্থ- তোমার প্রভূর দিকে। رَاضِيَةً অর্থ- সন্তুষ্ট চিত্তে আর مَّرْضِيَّةً অর্থ- সন্তুষ্টভাজন হয়ে। فَ অর্থ- অতঃপর ادْخُلِي এই শব্দটিও واحد مؤنث امر حاضر معروف অর্থ- তুমি প্রবেশ করো। فِي এটি حروف جر অর্থ- মধ্যে। عِبَادِي অর্থ- আমার বান্দাদের। وَ অর্থ- এবং। আর ادْخُلِي এটিও واحد مؤنث امر حاضر معروف অর্থ- প্রবেশ করো। جَنَّتِي অর্থ- আমার জান্নাতে।

সরল বাংলায় আনুবাদ

"হে প্রশান্ত আত্মা! তোমার প্রতিপালকের দিকে ফিরে এসো সন্তুষ্ট চিত্তে এবং প্রতিপালকের সন্তুষ্টির পাত্র হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের মধ্যে শামিল হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।"[১]

বিষয়বস্তু ও অবতরণের প্রেক্ষাপট

এই আয়াতগুলোতে প্রকৃত বিশ্বাসী নর-নারীদের অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কারণ প্রকৃত ঈমানদারগণ সুখে-দুঃখে সর্বদা মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে এবং সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকে। তাই তাদের হৃদয় থাকে আলোকিত ও আত্মা থাকে প্রশান্ত। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাদের আত্মার এই অবস্থাকে ভালোবেসে আহ্বান করেছেন– "হে প্রশান্ত আত্মা" বলে। যা মু'মিন নর-নারীর জন্য মহান প্রভূর পক্ষ থেকে এক অতীব সম্মানজনক ও স্নেহময় আহ্বান। মু'মিন নর-নারীদের জন্য এটি হলো এক মহামূল্যবান উপঢৌকন। বর্ণনা দেওয়া হয়েছে মহান রবের পক্ষ থেকে তাদেরকে দেওয়া পুরুস্কারের যা সুখের সামগ্রী দ্বারা পরিপূর্ণ অর্থাৎ- জান্নাত।

মক্কায় যখন ইসলাম গ্রহণকারীদের উপর ব্যপকভাবে নির্যাতন নিপীড়ন চলছিল তখন মক্কার কাফের মুশরিকদের সতর্ক করার জন্য আদ, সামুদ ও ফিরাউনের নির্মম পরিণাম দেখিয়ে এবং তাদের হাতে নির্যাতীত মু'মিন নর-নারীদের প্রশান্ত হৃদয়ের পুরুস্কার বর্ণনা দিয়ে এই সূরা অবতীর্ণ করা হয়। দরসে উল্লেখিত চারটি আয়াত সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, এগুলো 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। অন্য বর্ণনা মতে হামযাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। তবে আয়াতসমূহের মাঝে নির্দিষ্টভাবে যেহেতু কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি তাই সকল মু'মিন নর-নারী এই সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত।

আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾

আলোচ্য আয়াতে মক্কার কাফের-মুশরিকদের অকথ্য নির্যাতন সহ্য করে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার প্রতি অবিচল বিশ্বাস যারা রেখেছে তাদেরকে তিনি সম্বোধন করে বলেন– হে উদ্বেগশূন্য চিত্ত!

---

* *প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, জা'মেআ দারুল ক্বোরআন, ঢাকা, বাংলাদেশ।*

[১] *সূরা আল ফাজ্‌র : ২৭-৩০।*

সত্যিই তো তাদের চিত্ত ছিল উদ্বেগশূন্য। একেবারে প্রশান্ত। তা না হলে ফেরাউনের কঠোরতম শাস্তিকে উপেক্ষা করে তার স্ত্রী আসিয়া বিনতু মুযাহিম কি মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তেও হাসতে পারতো আর বলতে পারতো–

﴿رَبِّ ابْنِ لِيْ عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ﴾

অর্থ- "হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য তোমার নিকট জান্নাতে একটি ঘর বানিয়ে দাও। আর আমাকে ফেরাউন ও তার দুষ্কর্ম হতে এবং এই যালেম সম্প্রদায় হতে মুক্তি দান করো।"[২]

কাফের-মুশরিকরা দুনিয়াবী ভোগ-বিলাস ও বিত্ত বৈভবের মধ্যে যতই থাকুক না কেন তাদের হৃদয় প্রশান্তি থেকে বঞ্চিত থাকে। পক্ষান্তরে– সাহাবী ইয়াসির ও তার স্ত্রী সুমাইয়া, খোবায়েব ও আসেমকে কি নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু তারপরেও তারা মহান আল্লাহর উপর ভরসা করেছিল। সন্তুষ্ট ছিল তার ফয়সালার উপর। তখন তাদের আত্মাও ছিল সন্তুষ্ট। হৃদয়েও ছিল অবারিত প্রশান্তি। তাইতো আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাদের আত্মাকে "প্রশান্ত আত্মা" বলে আহ্বান করেছেন।

﴿ارْجِعِيْ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾

এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা "নফসে মুত্বমাইন্না"কে লক্ষ্য করে বলেন– তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তুষভাজন হয়ে।

আত্মা যে আল্লাহ তা'আলার প্রতি সন্তুষ্ট। এতেই বুঝা যায়, আল্লাহ তা'আলাও তার প্রতি সন্তুষ্ট। কেননা বান্দার প্রতি আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট না হলে বান্দা মহান আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট হওয়ার তাওফীক্ব পায় না।

এখন প্রশ্ন হলো– এই কথাটি কখন বলা হবে। কেউ কেউ বলেন– মৃত্যুকালে অথবা কিয়ামতের দিন জীবিত হয়ে হাশ্‌রের ময়দানের দিকে যখন যেতে থাকবে তখন বলা হবে। কেউ কেউ বলেন– মহান আল্লাহর আদালতে যখন পেশ করা হবে তখন এ কথা বলা হবে। প্রতিটি পর্যায়ে তাকে এই মর্মে নিশ্চয়তা দেওয়া হবে যে, সে মহান আল্লাহর রহমতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।[৩] অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলবেন–

﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِيْ ○ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ﴾

"আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।"

এই আদেশ থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায়, জান্নাতে প্রবেশ করা মহান আল্লাহর বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উপর নির্ভরশীল। এখানে বান্দা বলে নেককার সৎ বান্দা উদ্দেশ্য। কেননা তাদের সাথেই জান্নাতে প্রবেশ করা যায়। এ জন্যই নবী সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) এই বলে দু'আ করেছিলেন–

﴿وَأَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ﴾

অর্থাৎ- "আর আপনার অনুগ্রহে আমাকে আপনার নেককার সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।"[৪]

অনুরূপ নবী ইউসূফ (আলাইহিস সালাম)-ও দু'আয় বলেছেন–

﴿وَأَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ﴾

"আর আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের সাথে মিলিয়ে দিন।"[৫]

এরূপ দু'আ নবী ইব্‌রাহীম (আলাইহিস সালাম)-ও করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন–

﴿رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَأَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ﴾

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের সাথে মিলিয়ে দিন।"[৬]

নেক বান্দাদের সংসর্গ লাভ আল্লাহ তা'আলার একটি মহা নিয়ামত, যা নবী-রাসূলগণও উপেক্ষা করতে পারতেন না।

---

[২] *সূরা আত্ তাহরীম : ১১।*

[৩] *তাফসীরে ইবনু কাসীর।*

[৪] *সূরা আন্ নামল : ১৯।*

[৫] *সূরা ইউসূফ : ১০১।*

[৬] *সূরা আশ্ শু'আরা- : ৮৩।*

নফস এর প্রকারভেদ

(نفس) "নাফস" শব্দটি আরবী। অর্থ-আত্মা, মন, প্রবৃত্তি, প্রাণী, মানুষ, ব্যক্তি ও স্বয়ং ইত্যাদি। কুরআন ও হাদীসের আলোকে সূফী-সাধকগণ নাফসের স্তর ভিত্তিক সুস্পষ্ট বর্ণনা পেশ করেছেন। তাদের বর্ণনা মতে– "নাফস" মূলতঃ তিন প্রকার। যথা-

এক. নাফসে মুত্বমাইন্নাহ অর্থাৎ- প্রশান্ত হৃদয়। এইটি মহান আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের "নাফস"। যা কোনো দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনায় ভীত ও দিশেহারা হয় না; বরং সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে সুদৃঢ় ও স্থির থাকে। যার গন্তব্য স্বয়ং স্রষ্টার সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্যে।

দুই. নাফসে লাউয়ামাহ্ অর্থাৎ- তিরস্কারকারী আত্মা। এই নাফস ত্রুটি ও মন্দকাজ থেকে সম্পুর্ণ মুক্ত হয় না। এই নাফস শয়তানের প্ররোচনায় যখনি মন্দকাজের দিকে আসক্ত হয় কিন্তু ঈমান, সৎকর্ম ও সাধনার ফলে সে আবার অনুতপ্ত হয়। কখনো কখনো কু-রিপুর কারণে সে আবার মন্দ কাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

তিন. নাফসে আম্মারা অর্থাৎ- অন্যায় কাজে প্ররোচনা দানকারী অন্তর। এই নাফস সর্বদা শয়তানের তাবেদারী করে। সর্বদা শয়তানের সাথে লড়াই করেই এই নাফসকে টিকে থাকতে হয়। এই নাফসের অধিকারীর পিছনে শয়তান সর্বদা লেগেই থাকে। তাই এই নাফসের অধিকারী ব্যক্তির উচিত সর্বদা এমন পরিবেশে থাকা যাতে শয়তান তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। এই নাফসকে দমিয়ে রাখাই সবচেয়ে বড় যিহাদ। যে এই যিহাদে জিততে পারে সেই দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত হয়।

দরসের শিক্ষাসমূহ

১. নাফসের বিরুদ্ধে যিহাদই প্রকৃত যিহাদ।
২. যে ব্যক্তি নাফসের বিরুদ্ধে যিহাদ করে টিকে থাকতে পারবে। সে ব্যক্তিই সফলতা লাভে ধন্য হবে।
৩. মৃত্যুর সময়ে জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়ার উপায় হলো– নাফসে মুত্বমাইন্নার অধিকারী হওয়া, ঈমানের উপর সুদৃঢ় থেকে প্রতিপালক হিসেবে মহান আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট থাকা।
৪. যেকোনো পরিস্থিতিতে মহান স্রষ্টার উপর সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তবেই মহান স্রষ্টা আপনার উপর সন্তুষ্ট থাকবেন।
৫. মহান আল্লাহর যে কোনো ফয়সালার উপর নাফসে মুত্বমাইন্না সদাসর্বদা সন্তুষ্ট ও সুদৃঢ় থাকে।
৬. নেককার ও সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারলেই জান্নাতে প্রবেশ করা সম্ভব।
৭. মহান আল্লাহর বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারাটাই একজন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ প্রদত্ত সবচেয়ে বড় নিয়ামত। ❑

সচেতনতা

০১. আপনি প্রতিনিয়ত যে খাদ্য অপচয় করছেন, সে খাদ্যেই একজন গরীব-দুঃখী, অনাহারী মানুষের অন্নকষ্ট নিবারণ হতে পারে। আসুন! আমরা মানবিক গুণ অর্জন করি : অনাহারী মানুষের অন্নকষ্ট নিবারণ করি।

০২. পানি আল্লাহ তা'আলার এক অফুরন্ত নি'আমাত। অযথা পানিতে ময়লা-আবর্জনা ফেলে নোংরা করা থেকে বিরত থাকি এবং পানির অপচয় রোধ করি।

০৩. বিদ্যুৎ জাতীয় সম্পদ। তাই বৈদ্যুতিক বাতি, পাখা ইত্যাদির অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার থেকে বিরত থাকি। আমাদের একটু সচেতনতা বিদ্যুৎ ঘাটতি পূরণে সহায়ক হবে।

০৪. প্রাকৃতিক গ্যাস একটি মূল্যবান সম্পদ। কিন্তু আমাদের কাছে এর মজুদ সীমিত। তাই এই সীমিত সম্পদের সঠিক ব্যবহার করি।

০৫. পরিবেশ সংরক্ষণ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। অন্তত ভবিষৎ প্রজন্মের কথা ভেবে হলেও ময়লা, আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে আমার চারপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখি। এটা আমার নৈতিক দায়িত্ব।

০৬. খাদ্যে ভেজাল জাতি ধ্বংসের অন্যতম হাতিয়ার, বিভিন্ন রোগের প্রধান উপসর্গও বটে। আমরা কেউই এই ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে নিরাপদ নই। খাদ্যে ভেজাল প্রদানকারীর বিরুদ্ধে গণসচেতনা গড়ে তুলি।

হাদীসে রাসূল ﷺ

রাগ নিয়ন্ত্রণকারীই প্রকৃত বীর

–আবূ তাহসীন মুহাম্মদ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অমিয় বাণী

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِيْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ.

সরল অনুবাদ

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘প্রকৃত বীর সে নয়, যে কাউকে কুস্তীতে হারিয়ে দেয়; বরং সেই প্রকৃত বীর, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম’।[৭]

হাদীসের রাবীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম ও পরিচিতি : আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র নামের ব্যাপারে ২০টির মতো মতামত পাওয়া যায়।[৮] প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তার নাম ছিল ‘আব্দুশ্ শামস বা আবদে ‘উমার।[৯]

ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নাম রাখা হয় ‘আব্দুর রহমান। কেউ বলেন তার নাম ‘আব্দুর রহমান ইবনু আইদ।[১০]

তিনি দক্ষিণ আরবের আযদ গোত্রের সুলায়ম ইবনু ফাহাম বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁর পিতার নাম সাখর এবং মাতার নাম উম্মিয়া বিনতু সফীহ মতান্তরে মায়মুনা।

আবূ হুরাইরাহ্ নামে নামকরণ : একদিন আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জামার আস্তিনের নিচে একটি বিড়াল ছানা নিয়ে রাসূল (ﷺ)-এর দরবারে উপস্থিত হন। বিড়ালটি হঠাৎ সকলের সামনে বেরিয়ে পড়ল। এ অবস্থা দেখে রাসূল (ﷺ) তাঁকে রসিকতা করে ‘হে বিড়ালের পিতা’! বলে সম্বোধন করলেন। এরপর থেকে তিনি আবূ হুরাইরাহ্ নামে খ্যাতি লাভ করেন।[১১]

ইসলাম গ্রহণ : তিনি ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ৭ম হিজরিতে মুহার্‌রম মাসে খায়বর যুদ্ধের প্রাক্কালে মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ত্রিশ বছরের মতো।[১২]

যুদ্ধে অংশগ্রহণ : ইসলাম গ্রহণের পর হতে তিনি ইসলামের সকল যুদ্ধে রাসূল (ﷺ)-এর সাথে অংশ গ্রহণ করেন।[১৩]

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান : সাহাবীদের মাঝে তিনিই সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট ৫৩৭৪টি মতান্তরে ৫৩৭৫টি।[১৪]

ইমাম বুখারীর মতে, আট শতাধিক রাবী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আসহাবে সুফ্ফার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

মৃত্যু : তিনি ৫৭ মতান্তরে ৫৮/৫৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তাকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।[১৫]

ব্যাখ্যা : রাগ বা ক্রোধ মনুষত্ব বিধ্বংসী এক কু-রিপু। রাগের সময় মানুষের পশুসুলভ আত্মা সক্রিয় হয়। বাহ্যিকভাবে চেহারার রং বিবর্ণ হয়ে যায়। আর শিরা-উপশিরা ফুলে-ফেঁপে উঠে। অনিয়ন্ত্রিত রাগ নিজের ‘আমল-আখলাকের জন্য শুধু ক্ষতিকর এমন নয়; বরং

---

[৭] *বুখারী- হা. ৬১১৪; মিশকাত- হা. ৫১০৫, সহীহ।*

[৮] *শরহে মুসলিম- ইমাম নববী, ১/৭ পৃ.।*

[৯] *আল-মুস্তাদরাক আলাস সহীহায়েন- ইমাম হাফিয আবূ ‘আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ‘আব্দিল্লাহ আল-হাকিম আন-নিশাপুরী, (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৪৬১/১৯৯০), ৩/৫৮১ পৃ.।*

[১০] *তাকরীবুত তাহযীব- হাফেয শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনু ‘আলী ইবনু হাজার আল-আসকালানী, (ভারত : আল-মাকতাবাতুল আশরাফিয়াহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৮/১৪০৮) পৃ. ৬৮০; উসদুল গাবাহ- ইবনুল আসীর, ৫/৩১৬ পৃ.; ত্বাবাক্বাত ইবনু সা'দ- ইবনু সা'দ, ৪/৩২৫ পৃ.।*

[১১] *আল-মুস্তাদরাক আলাস সহীহায়েন- ৩/৫৭৯।*

[১২] *সিয়ার আলামিন নুবালা- শামসুদ্দীন আয যাহাবী, (বৈরুত : মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪১৪/১৯৯৬), ২/১৯৫।*

[১৩] *বিশ্বনবীর সাহাবী- তালেবুল হাশেমী, অনুবাদ : আব্দুল কাদের (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৪১৪/১৯৯৪) ১/১৩৫।*

[১৪] *আসমাউস সাহাবাতির রুয়াত- পৃ. ৪; তালক্বী- পৃ. ১৮৪; শরহে মুসলিম- নববী, মুকাদ্দামাহ পৃ. ৮; উমদাতুল ক্বারী- ১/১২৪।*

[১৫] *তাহযীবুত তাহযীব- হাফেয শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনু ‘আলী ইবনু হাজার আল-আসকালানী, ১২/২৪০।*

শরীরের জন্যও ক্ষতিকর। অতিরিক্ত রাগের কারণে, হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ে; স্ট্রোকও করতে পারে। রাগের বশবর্তী হয়ে কারোর সঙ্গে অন্যায় আচরণ করা অত্যন্ত জঘন্য কাজ। শুধু রাগের কারণে, কর্মস্থলে কতো হেনস্তা হতে হয় তা ভুক্তভোগী সকলেরই জানা।

রাগের বিপরীত হলো সহনশীলতা। নবী করীম (ﷺ) উম্মতকে অত্যন্ত কঠোরভাবে অনুশীলন করে যে সকল চারিত্রিক গুনাবলী অর্জন করতে বলেছেন, তার একটি হলো সহনশীলতা। জারীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র সূত্রে বর্ণিত, নবী করীম (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি নম্রতা থেকে বঞ্চিত, সে সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।[১৬]

রাগ নেই, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। জ্ঞানীরা বলেন, রাগ হলো বারুদের গুদামের মতো, যা মানুষের স্বাভাবিক অর্জনকে মুহূর্তেই ধ্বংস করে দিতে পারে। তাই রাগ নিয়ন্ত্রণের কোনো বিকল্প নেই। মানুষ সাধারণত কোনো কারণ ছাড়া ক্রুদ্ধ হয় না। এর পেছনে কোনো না কোনো কারণ থাকে। সেই কারণ যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে, আবার অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্যও হতে পারে। সাধারণত ব্যর্থতা, অযৌক্তিক প্রত্যাশা, হিংসা-বিদ্বেষ, অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ানোর মতো বদ অভ্যাস, অবিচার, জুলুম ও দারিদ্র্যের মতো সামাজিক অসঙ্গতিগুলো মানুষের রাগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (ﷺ) প্রচুর আত্মসংযম ও ধৈর্যশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, যখন তাঁকে অপমান, অপদস্ত ও শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছিল। জীবনের এক কঠিনতম সময়ে আমাদের প্রিয় নবীজি (ﷺ) তায়েফে গিয়েছিলেন, আশা করেছিলেন তায়েফবাসী তাঁর কথা শুনবে, তাঁকে সহযোগিতা করবে। কিন্তু সহযোগিতার পরিবর্তে তিনি পেলেন অপমান। তাঁর শরীর থেকে রক্ত গড়িয়ে পায়ে গিয়ে জমাট বাঁধল। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর কাছে একজন ফেরেশ্‌তা এলেন। ফেরেশ্‌তা তায়েফের দু'পাশের পাহাড় এক করে দিয়ে তায়েফবাসীকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু নবী (ﷺ)-এর উত্তর ছিল, '(না, তা হতে পারে না) বরং আমি আশা করি আল্লাহ তা'আলা তাদের বংশে এমন সন্তান দেবেন, যারা এক মহান আল্লাহর 'ইবাদত করবে, তাঁর সঙ্গে শরিক করবে না।

ইসলাম রাগ দমনের নির্দেশ দানের পাশাপাশি রাগ দমনকারীর জন্য বহু পুরস্কারের কথাও ঘোষণা করেছে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ﴾

"আল্লাহর দয়ায় তুমি তাঁদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়েছিলে। যদি তুমি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতে, তবে তাঁরা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদের ক্ষমা করো এবং তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং কাজে-কর্মে তাঁদের সাথে পরামর্শ করো, অতঃপর তুমি কোনো সংকল্প করলে আল্লাহর ওপর নির্ভর করবে। যারা নির্ভর করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন।"[১৭]

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র আল কুরআনুল কারীমে মুহসিন বান্দাদের গুণাবলী সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন,

﴿اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ﴾

অর্থ : "যারা সচ্ছলতা ও অভাবের মধ্যে ব্যয় করে এবং রাগ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আর আল্লাহ মুহসিনদেরকে ভালোবাসেন।"[১৮]

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক মুহসিন বান্দাদের তিনটি গুণের কথা বলেছেন। যেমন- সচ্ছল অবস্থায় থাকো কিংবা অসচ্ছল অবস্থায় থাকো সর্বাবস্থায় ব্যয় করো। এরপর বলা হয়েছে, ক্রোধ দমন করো এবং ক্ষমা প্রদর্শন করো। এই তিনটি মৌলিক গুণ জান্নাতে যেতে হলে মুহসিনদের অবশ্যই থাকতে হবে।

এক ব্যক্তি রাসূল (ﷺ)-কে বললেন, 'আপনি আমাকে ওয়াসীয়ত করুন। তিনি বললেন, "তুমি রাগ করো

[১৬] *সহীহ মুসলিম।*

[১৭] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৫৯।*

[১৮] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৩৪।*

না”। ওই ব্যক্তি কয়েকবার তা বললেন। রাসূল (ﷺ) প্রতিবারই বললেন, “রাগ করো না”।’[১৯]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেন, ‘রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের আরো উপদেশ দিয়েছেন যে, “যদি তোমাদের কেউ রাগান্বিত হয়ে পড়ে, তবে তাকে নীরব থাকতে দাও।”

যদি কোনো ব্যক্তি শান্ত বা নীরব হওয়ার চেষ্টা করে, তবে এই প্রচেষ্টা তাকে অবশ্যই মারামারি কিংবা বাজে কথা বলা থেকে বিরত রাখবে।

নিন্দনীয় রাগে ফেরেশ্‌তাদের অভিসম্পাত

নিন্দনীয় রাগে ফেরেশ্‌তারা অভিসম্পাত দেন। হাদীসে এসেছে–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, কোনো লোক যদি নিজ স্ত্রীকে নিজ বিছানায় আসতে ডাকে আর সে অস্বীকার করে এবং সে ব্যক্তি স্ত্রীর উপর দুঃখ নিয়ে রাত্রি যাপন করে, তাহলে ফেরেশ্‌তাগণ এমন স্ত্রীর উপর সকাল পর্যন্ত লানত দিতে থাকে।[২০]

রাগ ঈমানকে নষ্ট করে

বাহয ইবনু হাকীম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার পিতার সূত্রে পিতামহ থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, রাগ ঈমানকে বিনষ্ট করে দেয়, সাবির গাছের তিক্ত রস যেমন মধুকে বিনষ্ট করে দেয়।[২১]

মোল্লা ‘আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় লেখেন, এখানে ঈমান নষ্ট দ্বারা ঈমানের পূর্ণতা ও নূর নষ্ট হওয়া উদ্দেশ্য। তবে কখনো কখনো মূল ঈমানও রাগের কারণে ঝুঁকিতে পড়তে পারে।[২২]

এ বিষয়ে আল্লামা মনজুর নুমানী (রহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন– ‘মানুষের খারাপ স্বভাবগুলোর মাঝে রাগ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ একটি স্বভাব; এর পরিণতিও অনেক ভয়াবহ। কারো রাগ উঠলে, মহান আল্লাহর হুকুম-আহকাম, নিজের লাভ-ক্ষতির চিন্তা মাথায় থাকে না। অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার আলোকে বলা যায়, রাগান্বিত অবস্থায় শয়তান যত সহজে মানুষকে কাবু করতে পারে, অন্যকোনো অবস্থায় পারে না। মানুষ ঐ অবস্থায় নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকে না, কেমন যেন ইবলিসের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। কখনো কখনো তো রাগের কারণে কুফুরি শব্দ বলে ফেলে। এজন্য নবী করীম (ﷺ) রাগকে ঈমান বিনষ্টকারী বলেছেন।[২৩]

রাগ কীভাবে দমন করবেন

শয়তান মানুষের বিনাশ ও ধ্বংসের মধ্যে আনন্দ পায়। শয়তানের চতুর্মুখী কুমন্ত্রণায় পড়ে মানুষ যাবতীয় অন্যায় কর্মে লিপ্ত হয়। শয়তানের অস্ত্রগুলোর মধ্যে প্রচণ্ড রাগ বা ক্রোধ অন্যতম। প্রচণ্ড রাগের সময় করণীয় সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) যেসব ‘আমলের কথা বলেছেন, সেগুলো হলো–

১. মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা : শয়তানের শত্রুতার কবল থেকে নিরাপত্তার জন্য আল্লাহ তা‘আলা তাঁরই নিকট আশ্রয় চাইতে বলেছেন। এ ব্যাপারে বেশ কিছু হাদীস রয়েছে।

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ (ﷺ) وَرَجُلَانِ يَسْتَبَّانِ فَأَحَدُهُمَا احْمَرَّ وَجْهُهُ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) إِنِّيْ لَاعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ فَقَالُوْا لَهُ إِنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) قَالَ تَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَقَالَ وَهَلْ بِيْ جُنُوْنٌ.

সুলাইমান ইবনু সুরাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (ﷺ)-এর নিকট বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় দু’জন লোক পরস্পরকে গালাগালি করছিল। তাদের একজনের মুখমণ্ডল (রাগে) লাল হয়ে গেল এবং তার গর্দানের রগগুলো ফুলে মোটা হয়ে উঠলো। তখন রাসূল (ﷺ) বললেন, ‘আমি এমন

---

[১৯] *সহীহুল বুখারী।*
[২০] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩২৩৭।*
[২১] *মিশকা-তুল মাসা-বীহ।*
[২২] *মিরকাত শরহে মিশকা-তুল মাসা-বীহ- খণ্ড : ৯, পৃ. ৩০৭।*
[২৩] *মাআরেফুল হাদীস- খণ্ড : ২, পৃ. ১৪৬।*

একটি কথা জানি, যা এই লোকটি বললে তার রাগ চলে যাবে। সে যদি বলে– "আমি শয়তান থেকে মহান আল্লাহর আশ্রয় চাই। তাহলে তার রাগ দূর হয়ে যাবে।" লোকেরা সে ব্যক্তিকে জানাল, 'রাসূল (ﷺ) বলেছেন, শয়তান থেকে মহান আল্লাহর আশ্রয় চাও।' তখন লোকটি বলল, 'আমি কি পাগল হয়েছি?'[২৪]

'উসমান ইবনু আবূ শায়বা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও সুলায়মান ইবনু সুরাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূল (ﷺ)-এর সামনে দু'ব্যক্তি পাগলামী করছিল। আমরাও তার কাছে বসা ছিলাম। তারা এতটা রাগান্বিত হয়ে পরস্পরকে গালি দিচ্ছিল যে, তাদের চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল। তখন রাসূল (ﷺ) বললেন– 'আমি একটি কালেমা জানি, যদি এ লোকটি তা পড়তো, তাহলে তার ক্রোধ চলে যেত। অর্থাৎ- যদি লোকটি "আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম" পড়তো।' তখন লোকেরা সে ব্যক্তিকে বলল, 'রাসূল (ﷺ) কী বলেছেন, তা কি তুমি শুনছো না?' সে বললো– 'আমি নিশ্চয়ই পাগল নই।'[২৫]

২. শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ.

"যখন তোমাদের কারো রাগ উঠে, তখন যদি সে দাঁড়ানো থাকে, তবে যেন বসে পড়ে। যদি তাতে রাগ চলে যায়, তাহলে তো ভালো। আর যদি না যায়, তবে শুয়ে পড়বে।"[২৬]

শরহুস সুন্নাহ নামক কিতাবে এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছে, 'বসা বা শোয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেন রাগের মাথায় এমন কোনো কাজ না করে, যার কারণে পরে লজ্জিত হতে হয়। কেননা, বসার কারণে অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। তার চেয়ে সম্ভাবনা কম থাকে যদি শুয়ে পড়ে। ইমাম ত্বিবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীস দ্বারা হয়তো বিনয়ী হওয়া উদ্দেশ্য। কেননা, রাগের বড় কারণ হলো অহংকার।[২৭]

৩. ওযূ করা : হাদীসে এসেছে–

حَدَّثَنَا أَبُوْ وَائِلٍ الْقَاصُّ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّعْدِيِّ، فَكَلَّمَهُ رَجُلٌ فَأَغْضَبَهُ، فَقَامَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ تَوَضَّأَ، فَقَالَ : حَدَّثَنِيْ أَبِيْ، عَنْ جَدِّيْ عَطِيَّةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) : إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ.

আবূ ওয়াইল আলকাস (রাহিমাহুল্লাহ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা উরওয়াহ ইবনু মুহাম্মাদ আস সা'দির নিটক গেলাম। তখন এক ব্যক্তি তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে তাকে রাগিয়ে দিলো। অতএব তিনি দাঁড়ালেন এবং ওযূ করলেন। অতঃপর বললেন, আমার পিতা আমার দাদা 'আত্বিয়্যাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, রাগ হচ্ছে শয়তানী প্রভাবের ফল। শয়তানকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আগুন পানি দিয়ে নিভানো যায়। অতএব তোমাদের কারো রাগ হলে সে যেন ওযূ করে নেয়।'[২৮]

৪. চুপ থাকা : 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'তোমরা শিক্ষা দাও এবং সহজ করো। কঠিন কোরো না। যখন তুমি রাগান্বিত হও তখন চুপ থাকো; যখন রাগান্বিত হও তখন চুপ থাকো; যখন রাগান্বিত হও তখন চুপ থাকো।'[২৯]

সব রাগ নিন্দনীয় নয় : রাগ নিন্দনীয় বিষয় হলেও সব রাগ দোষনীয় নয়। এমন কিছু রাগ রয়েছে, যা প্রশংসনীয়। মূলত রাগ দুই প্রকার।

১. নিন্দনীয় রাগ : নিন্দনীয় রাগ হলো সেই সব জাগতিক রাগ, যার ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)

[২৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩২৮২।*
[২৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৯৮৫।*
[২৬] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪৭৮৪।*
[২৭] *মিরকাত শরহে মিশকা-তুল মাসা-বীহ- খণ্ড : ৯, পৃ. ৩০২।*
[২৮] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪৭৮৪।*
[২৯] *মুসনাদে আহমদ- হা. ৪৭৮৬।*

উম্মতকে সতর্ক করেছেন। যেমনটি উপর্যুক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

২. **প্রশংসনীয় রাগ :** যেসব রাগ আল্লাহ, তার রাসূল (ﷺ) ও দ্বীনের স্বার্থে করা হয়, তা প্রশংসনীয় রাগ। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কখনো ব্যক্তিগত ব্যাপারে কারোর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে কেউ মহান আল্লাহর নিষিদ্ধ কোনো কাজ করে ফেলল, তার জন্য যথাবিহিত শাস্তির ব্যবস্থা করতেন।'[৩০]

রাগ অবস্থায় কোনো বিচার ফায়সালা না করা

রাগ অবস্থায় কোনো বিচার ফায়সালা করা যাবে না। হাদীসে এসেছে–

عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ كَتَبَ أَبُوْ بَكْرَةَ إِلَى ابْنِهِ وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ بِأَنْ لَا تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ﷺ) يَقُوْلُ لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.

'আব্দুর রাহমান ইবনু আবূ বকরাহ্ (রহিমাহুল্লা-হ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আবূ বকরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) তাঁর ছেলেকে লিখে পাঠালেন– সে সময় তিনি সিজিস্তানে অবস্থান করছিলেন– যে তুমি রাগের হালতে বিবাদমান দু' লোকের মাঝে ফায়সালা করো না। কেননা, আমি নবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, কোনো বিচারক রাগের হালতে দু'জনের মধ্যে বিচার করবে না।[৩১]

এ বিষয়ে ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রহিমাহুল্লা-হ) বলেন, প্রকৃত শক্তিশালী ঐ ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় হিতাহিত জ্ঞান না হারিয়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আর ক্রোধ যদি তার উপর বিজয় লাভ করে, তাহলে বুঝতে হবে প্রকৃতপক্ষে সে শক্তিশালী বা বীর কোনোটিই নয়'।[৩২]

রাগ নিয়ন্ত্রণের পুরস্কার

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (ﷺ) প্রচুর আত্মসংযম ও ধৈর্যশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, যখন তাঁকে অপমান, অপদস্থ ও শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছিল। রাগ নিয়ন্ত্রণ মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। যে ব্যক্তি রাগ নিয়ন্ত্রণ করে, সে আধ্যাত্মিক ও জাগতিকভাবে পুরস্কৃত হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

"মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে বান্দার ক্রোধ সংবরণে যে মহান প্রতিদান রয়েছে, তা আর অন্য কিছুতে নেই।"[৩৩] হাদীসে এসেছে–

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ : مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ، دَعَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُءُوْسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ مَا شَاءَ.

সাহ্ল ইবনু মু'আয (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার রাগ প্রয়োগের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সংযত থাকে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে সব সৃষ্টির মধ্য থেকে ডেকে নেবেন এবং তাকে হুরদের মধ্য থেকে তার পছন্দমতো যেকোনো একজনকে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেবেন।'[৩৪]

এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, যারা দুনিয়ায় রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না, তারা এই মহা নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হবে। ক্রোধের আগুনে অন্যকে জ্বালিয়ে দেওয়াই বীরত্ব নয়। এতে মানুষের সম্মান বাড়ে না; বরং ক্রোধ ও প্রতিশোধপরায়ণতা মানুষকে হালকা করে দেয়।

রাগ বা ক্রোধ মানুষের জীবনের অন্যতম একটি মন্দ দিক। কারো রাগ যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, তখন সেটা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রাগান্বিত মানুষ নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। ফলে সে অন্যের ওপর অবলীলায় অত্যাচার-অবিচার করে বসে। রাগ মানবিক আবেগেরই অংশ। তবে অনিয়ন্ত্রিত রাগ মানুষের জন্য ক্ষতিকারক। কেননা তা নানান সমস্যা সৃষ্টি করে। যে ব্যক্তি রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে, সে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রসহ সকল অঙ্গনে সফলতা বয়ে আনতে সক্ষম হয়। মাত্রাতিরিক্ত রাগ কখনোই ভালো নয়। সবকিছুর মধ্যে ভারসাম্য জরুরি। ❑

---

[৩০] *আল জামে' বাইনাস সাহীহাঈন- হা. ৩১৮৪।*
[৩১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৭১৫৮; সহীহ মুসলিম- হা. ১৭১৭।*
[৩২] *ইস্তেকামাহ- ২/২৭১ পৃ.।*
[৩৩] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৪১৮৯।*
[৩৪] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪৭৭৭।*

প্রবন্ধ

মহান আল্লাহর গজবে ধ্বংসপ্রাপ্ত কতিপয় জাতির ইতিকথা

–আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

[পর্ব– ০৩]

৪. মহান আল্লাহর গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত বিশ্বের প্রধান ছয়টি জাতির মধ্যে সামুদ জাতির পর লূত (আলাইহিস সালাম)-এর জাতি ছিল চতুর্থ জাতি।

লূত (আলাইহিস সালাম) ছিলেন ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র হারানের সন্তান। তাঁর শৈশবকাল কেটেছে ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর স্নেহাবেশে। ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) লূত (আলাইহিস সালাম)-কে লালন-পালন করেন। ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর সময়কালে যুগপৎভাবে লূত (আলাইহিস সালাম) নবুওয়্যাতের দায়িত্ব পালন করেছেন। দুঃখজনকভাবে তখন বিকৃত পাপাচারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর জাতি। ইরাক ও ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী স্থানে এই জাতিটির বসবাস ছিল। এই জাতির কেন্দ্রীয় শহর ছিল 'সাদুম' নগরী। সাদুম ছিল সবুজ শ্যামলী এক সমৃদ্ধ নগরী। কারণ এখানে প্রাকৃতিকভাবে পানির পর্যাপ্ত সরবরাহ ছিল। ফলে ভূমি হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত উর্বর এবং শস্যে ভরপুর। এমন প্রাচুর্যেভরা জীবনযাত্রা তাদের বেপরোয়া করে তোলে। যৌনাচারের বিকৃত বাসনা তাদের চেপে বসে। শুধু তাই নয়, পৃথিবীতে তাদের মধ্যেই সর্বপ্রথম সমকামিতার প্রবণতা দেখা দেয়। এ জঘন্য অপকর্মে তারা প্রকাশ্যে করে আনন্দ লাভ করত।

একে তো কাফের ছিল, তার উপর এমন এক জঘন্য অপকর্ম ও লজ্জাকর অনাচারে লিপ্ত ছিল যা– পূর্বে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ- পুরুষ কর্তৃক অন্য পুরুষের সাথে মৈথুন করা। ব্যভিচারের চেয়েও যা জঘন্য অপরাধ। এ বিষয়ে লূত (আলাইহিস সালাম)-এর স্ত্রীর সহযোগিতা থাকতো। তিনিও ছিলেন বিপথগামীনি দুরাচার মহিলা।

'আযাবের ফেরেশ্তাগণ সুদর্শন পুরুষের রূপ ধরে লূত (আলাইহিস সালাম)-এর মেহমান হন। লূত (আলাইহিস সালাম) গোপনে তাদেরকে আশ্রয় দেন, কিন্তু লূত (আলাইহিস সালাম)-এর স্ত্রী এই খবর পাপাচারী সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছে দেয়। সে ছিল ঐ জাতির যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সমর্থক। লূত (আলাইহিস সালাম) তাঁর সম্প্রদায়কে বাধা দিতে থাকেন। কিন্তু তারা কোনো বাধাই যেন মানতে চায় না। তখন জিবরীল (আলাইহিস সালাম) বের হয়ে তাদের মুখের উপর তার ডানা দিয়ে এক ঝাপটা মারেন। আর তাতেই তারা অন্ধ হয়ে যায়। তারা যখন ফিরছিল তারা পথ দেখতে পাচ্ছিল না। আল্লাহ তা'আলা দুরাচারদের অন্তরের কুবাসনা ও অমোঘ শাস্তির বিষয়ে বললেন,

﴿وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ فَذُوْقُوْا عَذَابِيْ وَنُذُرِ﴾

অর্থ : "আর অবশ্যই তারা লূতের কাছ থেকে তার মেহমানদেরকে অসদুদ্দেশ্যে দাবি করল, তখন আমরা তাদের দৃষ্টি শক্তি লোপ করে দিলাম এবং বললাম, আস্বাদন করো আমার শাস্তি এবং ভীতির পরিণাম।"[৩৫] ফেরেশ্তাগণ লূত (আলাইহিস সালাম)-এর অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করে প্রকৃত রহস্য ব্যক্ত করলেন, যা কুরআন মাজীদে চমৎকারভাবে বিধৃত হয়েছে–

﴿قَالُوْا يَا لُوْطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوْا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيْبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ﴾

অর্থ : "আগন্তুকরা বলল, 'হে লূত! আমরা তোমার প্রতিপালক প্রেরিত বার্তাবাহক, তারা তোমার কাছে কখনো পৌঁছতে পারবে না, কাজেই কিছুটা রাত বাকী থাকতে তুমি তোমার পরিবার-পরিজন নিয়ে বেরিয়ে পড়ো, তোমাদের কেউ যেন পিছনের দিকে না তাকায়। কিন্তু তোমার স্ত্রী (তোমাদের সঙ্গী হতে পারবে না) তারও তাই ঘটবে, অন্যদের যা ঘটবে।

* **ভাইস-প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস; **প্রফেসর ও ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

[৩৫] সূরা আল কামার : ৩৭।

সকাল হলো তাদের (শাস্তি আসার) নির্ধারিত সময়, সকাল কি নিকটবর্তী নয়?"[৩৬]

অপরিণামদর্শী ও উদ্ধত জাতির উপর এমন কঠিন আযাব নাযিল হয়েছে যা অন্য কোনো অপকর্মকারীদের উপর কখনো নাযিল হয়নি। উক্ত ভয়াবহ 'আযাবের ধরণ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ﴾

অর্থ : "তারপর আমার নির্দেশ যখন এসে গেল, তখন আমি সেই জনপদকে উপর নীচ করে উল্টে দিলাম, আর তাদের উপর স্তরে স্তরে পাকানো প্রস্তর বর্ষণ করলাম।"[৩৭] একই সূরায় আরো বর্ণিত হয়েছে–

﴿مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾

অর্থ : "যে প্রস্তর খণ্ডের প্রতিটিই তোমার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নিত ছিল। যালিমদের জন্য এ শাস্তি বেশি দূরের ব্যাপার নয়।"[৩৮]

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যেকটি পাথরকে কি ধ্বংসাত্মক কাজ করতে হবে এবং কোন পাথরটি কোন অপরাধীর উপর পড়বে তা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছিল, যেমনটি নরাধম আবরাহার প্রতি আবাবিল পাখির কংকর নিপতিত হয়েছিল।[৩৯]

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীসে এতদসম্পর্কিত সাবধানতা ও পরিণামের বিষয়ে উদ্ধৃত হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) : مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ، فَاقْتُلُوْا الْفَاعِلَ، وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ.

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : তোমরা কাউকে যদি লূত গোত্রের মতোই কুকর্মে লিপ্ত দেখতে পাও তাহলে কর্তা ও যার সঙ্গে করা হয়েছে তাদের উভয়কে হত্যা করো।[৪০]

লূত (আলাইহিস সালাম)-এর জাতির ধ্বংসস্থলটি বর্তমানে বাহারে মাইয়েত বা বাহারে লূত নামে খ্যাত। ডেড সি বা মৃত সাগর নামেও পরিচিত যা এখন জর্ডান ও ইসরাঈল সীমান্তে অবস্থিত। এ বিস্ময়কর সাগরটি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা নিচু জায়গায় অবস্থিত। স্বাভাবিক লবণাক্ততার পরিমাণ ৩০%। এই পানিতে প্রচুর পরিমাণে ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড ও বিষাক্ত পদার্থের কারণে কোনো মাছ, ব্যাঙ, এমনকি কোনো জলজ প্রাণীও বেঁচে থাকতে পারে না। এ কারণেই একে 'মৃত সাগর' বলা হয়। এর পানির আপেক্ষিক ঘনত্ব এতো বেশি যে, হাত-পা বেঁধে ফেলে দিলেও কেউ ডোবে না।

শ্যামলীময় উপসাগর বেষ্টিত এলাকাটিতে এখনো এক ধরনের অপরিচিত উদ্ভিদের বীজ পাওয়া যায়। সেগুলো মাটির স্তরসমূহে প্রোথিত আছে। সেখানে প্রাপ্ত শ্যামল উদ্ভিদ কাটলে ধুলাবালি ও ছাই পাওয়া যায়। এখানকার মাটিতে প্রচুর গন্ধক মেলে। এই গন্ধক উল্কাপতনের অকাট্য প্রমাণ। ১৯৬৫ সালে ধ্বংসাবশেষ অনুসন্ধানকারী একটি আমেরিকান দল ডেড সি'র পার্শ্ববর্তী এলাকায় এক বিরাট কবরস্থান দেখতে পায়, যার মধ্যে ২০ হাজারেরও বেশি কবর আছে। এ থেকে অনায়াসে অনুমান করা যায় যে, কাছে কোনো বড় শহর ছিল। কিন্তু আশেপাশে এমন কোনো শহরের ধ্বংসাবশেষ নেই যার সন্নিকটে এত বড় কবরস্থান হতে পারে। এতে অনুমিত হয় যে, শহরটি সাগরে নিমজ্জিত হয়েছে।

সাগরের দক্ষিণে যে অঞ্চল রয়েছে, তার চারিদিকে ধ্বংসলীলা দেখা যায়। জমির মধ্যে গন্ধক, আলিকাতরা, প্রাকৃতিক গ্যাস এত বেশি মজুত দেখা যায় যে, এটি দেখলে মনে হয়, কোনো এক সময় বিদ্যুত পতনে বা ভূমিকম্পে গলিত পদার্থ বিস্ফোরণে এখানে এক 'জাহান্নাম' তৈরি হয়েছিল। *[চলবে ইন্‌শা-আল্লাহ]*

---

[৩৬] সূরা হূদ : ৮১।

[৩৭] সূরা হূদ : ৮২।

[৩৮] সূরা হূদ : ৮৩।

[৩৯] লূত (আলাইহিস সালাম)-এর পাপিষ্ঠ জাতির উপর সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রলয় নেমে আসে। এক শক্তিশালী ভূমিকম্প পুরো নগরটি সম্পূর্ণ উল্টে দেয়। ঘুমন্ত মানুষের উপর তাদের ঘরবাড়ি আছড়ে পড়ে। পাশাপাশি আকাশ থেকে বৃষ্টির মতো কংকর নিক্ষিপ্ত হতে থাকে। ওই মহাপ্রলয়ের হাত থেকে কেউই রেহাই পায়নি।

[৪০] সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪৪৬২, হাসান সহীহ।

ইসলামী শিক্ষা
একটি প্রাসঙ্গিক ভাবনা

–আবূ ফাইয়ায মুহাম্মদ গোলাম রহমান*

বিজ্ঞানের অবদানে পৃথিবী চরম উৎকর্ষতা লাভ করলেও হাল আমলের মানুষ চরম আধ্যাত্মিক সংকটে দিগ্‌ভ্রান্ত ও হতভম্ব। উদ্‌বেগ-উৎকণ্ঠা, মানসিক অস্থিরতা এবং নিরাপত্তাহীনতা যেন আদম সন্তানদের পিছু ছাড়ছে না। প্রশান্তি, চিত্তের স্থিরতা, উৎপাতশূন্যতা এবং নিরাপত্তা যেন ধীরে ধীরে নির্বাসিত হচ্ছে। কেন এ নেতিবাচক অবস্থার সৃষ্টি হলো?

মহানবী মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, "প্রতিটি শিশু ফিতরাত অর্থাৎ- স্বভাবধর্মের উপর জন্মগ্রহণ করে, এরপর তার বাবা-মায়ের কারণে সে ইহুদি, নাসারা (খ্রিষ্টান) ও অগ্নিপূজকে পরিণত হয়।" মহানবীর বাণী থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, বাবা-মায়ের ভুল প্রতিপালনে সন্তান বিপথগামী-পথভ্রষ্ট এবং লক্ষ্যচ্যুত হয়। অথচ প্রতিটি বাবা-মায়ের একান্ত প্রত্যাশা, স্বীয় সন্তান সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে, জগতজোড়া খ্যাতি লাভ করবে এবং আলোকিত ভুবন গড়ে হিমাদ্রি-শিখরে আরোহণ করবে। কিন্তু সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় তাদের প্রত্যাশার সাথে প্রাপ্তির বিস্তর ব্যবধান দিন দিন যেন বেড়েই চলছে।

আজকাল প্রায় সকল অভিভাবকের অভিযোগ! ছেলেমেয়েরা বড্ড বেপরোয়া হয়ে উঠছে। বাবা-মা, অভিভাবক, শিক্ষক এবং গুরুজনদের কথা শুনতে চায় না। যা ইচ্ছে তা-ই করে। তাদের চলাফেরা অবাধ, তাদের আচরণ অনভিপ্রেত, তাদের ইচ্ছা অনিয়ন্ত্রিত, তাদের আকাঙ্ক্ষা অনিয়মিত, তাদের কার্যকলাপ অসংযত– এমন হাজারো অভিযোগ।

এই অসংযত, অনিয়মিত, অনভিপ্রেত ও অনিয়ন্ত্রিত অবস্থার জন্য নৈরাশ ও নৈরাজ্য আজ সর্বত্র। বাবা-মা দিশেহারা। সমাজ ক্ষত-বিক্ষত। পিতামাতা এবং সমাজের জন্য এটা আজ প্রকট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ দুরারোগ্য ব্যাধিতে ইউরোপ-আমেরিকাসহ পাশ্চাত্যের দেশসমূহ যেমন আক্রান্ত, আরব-মধ্যপ্রাচ্যসহ আমাদের দেশ তথা সারা বিশ্ব সংক্রামিত। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তনের কি কোনো উপায় নেই?

এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আজ সর্বব্যাপী চলছে গবেষণা। নেপোলিয়ান আত্ম-উপলব্ধিবোধ থেকে বলেছিলেন– "আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি দেব।"

ইংরেজ শিক্ষাবিদ Stanly Hall যথার্থই বলেছেন যে, শিক্ষার্থীদের কেবল রুজি-রোজগারের পন্থা শিখালে হবে না; বরং নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে, তবেই তারা মানবীয় গুণসম্পন্ন সুশিক্ষিত মানুষ হবে। তিনি বলেছেন :

If you teach them the three `R`s, i.e. Reading, Writing and Arithmetic and don't teach them the forth `R`s, i.e. Religion, they are sure to become the fifth `R`s, i.e. Rascal.

"শিক্ষার্থীদের কেবল পঠন, লিখন ও গণিত শিখানো হলো, কিন্তু ধর্মের জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হলো না, তবে তো তারা (রাসকেল) দুষ্টাশয় হয়ে পড়বেই।"

নৈতিক শিক্ষা দানের মৌলিক হাতিয়ার ধর্ম। মানুষের মাঝে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ধর্মীয় অনুশাসনের বিকল্প নেই। ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার মাধ্যমে একজন মানুষ পাপ-পঙ্কিলতা মুক্ত পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করতে পারে। ধর্ম মানুষকে সত্যের পথে পরিচালিত করে, সমাজের মানুষের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে এবং ধর্মীয় বিধান প্রতিপালনের মাধ্যমে মানুষ ধৈর্যশীল হয়ে ওঠে। ধৈর্যশীলতা আদম সন্তানকে সাফল্যের পথে পরিচালিত করে।

'ইল্‌ম অর্জনের আবশ্যকতা : প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন করা ফর্‌য। জ্ঞান অর্জনের বা শিক্ষা গ্রহণের গুরুত্ব এত বেশি যে, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা পবিত্র কুরআন নাযিলের সূচনা করেছিলেন

* সহযোগী সম্পাদক, সাপ্তাহিক আরাফাত

'ইকরা' অর্থাৎ- 'পড়ো' শব্দ দিয়ে। সুমহান আল্লাহ বলেন,

﴿اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ﴾

"পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।"[৪১]

পুনশ্চ ইরশাদ হচ্ছে–

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوْ الْأَلْبَابِ﴾

"আপনি বলুন, যারা জ্ঞানী আর যারা অজ্ঞ তারা কি সমান হতে পারে? তারাই উপদেশ গ্রহণ করে, যারা বুদ্ধিমান।"[৪২]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ﴾

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা সমুন্নত করেছেন। তোমরা যা করো আল্লাহ সে ব্যাপারে পূর্ণ অবহিত আছেন।"[৪৩]

অপরদিকে মহানবী মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন,

طَلَبُ العِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ.

"'ইল্‌ম অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিমের (নর-নারী) ওপর ফর্‌য।"[৪৪]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরো বলেন,

مَنْ يُرِدْ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِيْ الدِّيْنِ.

"আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ চান, তিনি তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন।"[৪৫]

সর্বোপরি সুসন্তান মা-বাবার জন্য অতুল্য নিয়ামতস্বরূপ। তারা জীবিত বাবা-মায়ের জন্য যেমন কল্যাণকামী, মৃত বাবা-মায়ের জন্য অপরিমেয় এক অ্যাসেট। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُه إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِه أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَه.

মানুষের মৃত্যুর পর ৩টি 'আমল ব্যতীত যাবতীয় 'আমলের পথ বন্ধ হয়ে যায়। তা হলো– ১. সাদাক্বায়ে জারিয়াহ্; ২. উপকারী 'ইল্‌ম (জ্ঞান) এবং ৩. এমন নেক সন্তান, যে তার জন্য দু'আ করে।[৪৬]

এখন আমাদের প্রশ্ন হলো– আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কোন বিদ্যার কথা বলেছেন? হ্যাঁ! অবশ্যই ওয়াহীর জ্ঞানার্জনের কথাই বলেছেন। ওয়াহীর জ্ঞান চিত্তে স্থিরতা এনে দেয়, আধ্যাত্মিক সংকট দূর করে, উৎকণ্ঠাশূন্যতা সাফল্য পদচুম্বন করে এবং বজ্রকঠিন হাশ্‌রে একমাত্র ওয়াহীর জ্ঞানই নাজাতের আলোকবর্তিকা হিসেবে জান্নাতুল ফিরদাউসের পথ-নির্দেশ দেয়।

ওয়াহীর জ্ঞান কি কেবল 'ইবাদত, মুয়ামালাত ও জিনায়াতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? না, কখনোই নয়! বরং বিষয়বস্তুর পারিপাট্যে এবং ভাবের গাম্ভীর্যে ওয়াহীর বিদ্যা স্থান ও কালের বহু উর্ধ্বে স্থান করে নিয়েছে। এর মধ্যে আছে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, জীবিকা অর্জন এবং চরিত্র গঠনের নিখুঁত দিক-দর্শন। যে ব্যক্তি ওয়াহীর জ্ঞানের সন্ধান পেয়েছে প্রকৃত প্রস্তাবে সেই সৌভাগ্যবান। নিশ্চয়ই জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে নিদর্শন।

ইসলামী শিক্ষা বা ওয়াহীর জ্ঞানের সাথে নৈতিকতার সম্পর্ক সুনিবিড়। যে বিদ্যাপীঠে "ক্ব-লাল্লাহ্" এবং ক্ব-লার রাসূল (ﷺ)-এর দারস-তাদরীস হয়, সেই প্রতিষ্ঠানকে আমরা ইসলামী বিদ্যাপীঠ বা 'মাদ্‌রাসা' বলি। সাধারণত মাদ্‌রাসাই হলো ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু।

[৪১] *সূরা আল আলাক্ব : ০১।*
[৪২] *সূরা আয্ যুমার : ৯।*
[৪৩] *সূরা আল মুজাদালাহ : ১১।*
[৪৪] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ২২৪।*
[৪৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ৭৩১২।*
[৪৬] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৬৩১; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১৩৭৬; সুনান আবূ দাউদ- হা. ২৮৮০।*

সকল মুসলিম মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে যে, কুরআন-সুন্নাহ হলো নৈতিকতার ভিত্তি। আর নৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ ভালো-মন্দের পার্থক্য জানে, সত্য-মিথ্যার প্রভেদ বুঝে। হালাল-হারামের বিধি-নিষেধ সম্বন্ধে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তারা সত্যকে গ্রহণ ও মিথ্যা বর্জন করে, মন্দ প্রত্যাখ্যান ও ভালোর অনুশীলন করে, হারাম ত্যাগ করে হালালের উপর সন্তুষ্টচিত্তে প্রতিষ্ঠিত থাকে। নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ মানবীয় গুণসম্পন্ন। তারা স্বীয় স্রষ্টা ও ইলাহ সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় সচেতন। নিজ পিতা-মাতার প্রতি সর্বদা নতজানু ও আনুগত্যশীল, শিক্ষক ও গুরুজনদের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাশীল, পরিবার-পরিজনের প্রতি অতন্দ্র দায়িত্বশীল, আত্মীয়তার বন্ধন সংরক্ষণে সদাজাগ্রত, প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক রক্ষায় যত্নবান, ইয়াতিম ও দুস্থদের প্রতি অনুগ্রাহী, আর স্রষ্টার সকল সৃষ্টির প্রতি কৃপানেত্র। নৈতিকতার গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদকে জঘন্য অপরাধ বলে গণ্য করে, অশ্লীলতাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে, দুর্নীতি, সুদ-ঘুষ এবং অবৈধ লেনদেনের অভিশাপ থেকে স্বীয় আত্মাকে পবিত্র রাখে। শঠতা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, ছলনা, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা, দম্ভ-অহংকার তাদের চরিত্রে কলঙ্ককালিমা লেপন করতে পারে না। নৈতিক গুণাবলিসম্পন্ন মানুষ যেন মর্তে নেমে আসা অমলিন শুভ্রাংশু।

ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য : সাধারণত যে বিদ্যাপীঠে কুরআন, হাদীস, আকাইদ, ফিকহ্, বালাগাত-ফাসাহাত, মানতিক ইত্যাদি পড়ানো হয়, সেই বিদ্যাপীঠকে আমরা মাদ্‌রাসা বলি এবং মাদ্‌রাসার শিক্ষাকেই ইসলামী শিক্ষা বলে গণ্য করি। পক্ষান্তরে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে আমরা 'সাধারণ শিক্ষা' বা 'আধুনিক শিক্ষা' বলে থাকি। এখন প্রশ্ন হলো– স্কুল-কলেজের শিক্ষা যদি আধুনিক শিক্ষা হয়, তবে যৌক্তিকতার নিরিখে বলতে হয় যে, 'ইসলামী শিক্ষা সেকেলে বা প্রাচীনপন্থি?' যদি তা-ই হয়, তবে মানুষ কেন আধুনিকতা ছেড়ে প্রাচীন ও সেকেলে বিদ্যার পিছনে ছুটবে?

দ্বিতীয়তঃ ইসলামী শিক্ষার বিপরীত উচ্চারণ কি অনৈসলামী শিক্ষা? অর্থাৎ- স্কুল, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে যা কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়, তা-কি ইসলাম সমর্থন করে না? তবে কি ইসলাম আধুনিকতার সাথে সংঘর্ষপূর্ণ?

প্রকৃতপ্রস্তাবে আমরাই শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভাজন সৃষ্টি করেছি। শিক্ষার মূল উৎস ওয়াহী; ওয়াহী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে। প্রথম মানব সাইয়্যিদিনা আদম (আলাইহিস সালাম)। আল্লাহ তা'আলা আদম (আলাইহিস সালাম)-কে (ওয়া 'আল্লামা আদামাল আসমা-আ কুল্লাহা) সকল কিছুর নাম শিক্ষা দিলেন। সে অর্থে মানবজাতির প্রথম শিক্ষক স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা আর প্রথম শিক্ষার্থী পিতা আদম (আলাইহিস সালাম)। পিতা আদমকে আল্লাহ তা'আলা ওয়াহীর জ্ঞান দান করেছেন এবং এই ওয়াহীর জ্ঞানের পূর্ণতা পেয়েছে সমগ্র জগতের নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাতে। সেই জ্ঞানেরই বাস্তব প্রতিচ্ছবি মহাগ্রন্থ আল কুরআনুল করীম, যা আজও আমাদের মাঝে নিখুঁত, নির্ভুল ও ত্রুটিহীনভাবে বিদ্যমান।

আল কুরআনে যেমন তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত, আদব-আখলাক, মুআমালাত-'ইবাদত প্রভৃতি বিদ্যমান, অনুরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, কাব্য-সাহিত্য, রাজনীতি-অর্থনীতি, সমাজবিধি-কূটনীতি প্রভৃতি এর পরতে পরতে বিরাজমান। হালজামানার মুসলিমগণ এ কথা ভুলে গেলেও আল কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব, উপযোগিতা এবং সর্বকালের প্রয়োজনসাধনে এই গ্রন্থের সক্ষমতার কথা অমুসলিম মনীষীগণ উদারচিত্তে স্বীকার করেছেন। উদাহরণস্বরূপ :

ফরাসি চিকিৎসাবিদ Dr. Maurice Bucaille তাঁর রচিত The Bible The Quran and Science গ্রন্থে কুরআনে বর্ণিত বিজ্ঞান বিষয়ক আয়াতগুলো সম্পর্কে লিখেছেন, 'কুরআনে এমন একটিও বক্তব্য নেই যা আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আপত্তিজনক বা সাংঘর্ষিক।' কুরআনের বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা সম্পর্কে তিনি বলেন, 'কুরআনকে বিজ্ঞানীদের জন্য বিজ্ঞানের একটি ইন্সটিটিউট, অভিধানবেত্তাদের জন্য একটি শব্দকোষ, ব্যাকরণবিদদের জন্য একটি ব্যাকরণশাস্ত্র,

কবি-সাহিত্যিকদের জন্য একটি কাব্যগ্রন্থ এবং আইনবিদদের জন্য আইনের এনসাইক্লোপিডিয়া হিসাবে গণ্য করা হবে।'

বিখ্যাত আরবি ও ইংরেজি অভিধান প্রণেতা ড. স্টাংগ্স বলেন, 'আমরা একথা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, দুনিয়ার মধ্যে কুরআন মাজিদের সমকক্ষ কোনো গ্রন্থই প্রণীত হয়নি।'

এখন উম্মাহ'র উদ্দেশে প্রশ্ন রাখতে চাই! পবিত্র কুরআন যদি সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস হয় তবে শিক্ষার মধ্যে বিভাজন কেন? কেন অভিভাবকগণ ইসলামী শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষার গোলকধাঁধায় পড়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে– স্বীয় সন্তানকে মাদ্রাসায় পাঠাবে নাকি স্কুলে?

আমরা জানি যে, আমিরুল মু'মিনিন খলিফা চতুষ্টয়ের যুগ, তৎপরবর্তী 'উমাইয়্যাহ্ যুগ (৬৩৩) থেকে 'আব্বাসীয় যুগ (৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত দ্বিমুখী কিংবা বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থাই চালু ছিল। এই একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার মাঝে জন্মেছিলেন ইমামে আজম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফে'য়ী, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী, ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্, ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লা-হু 'আম্হুম)-গণের মতো পৃথিবী বিখ্যাত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামতি ইমামগণ। পরবর্তীতে তাঁদের ছাত্রতুল্য প্রজন্মও এই ধরাধামে আর আসেনি।

অপরদিকে বিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ রসায়নের জনক যাবির ইবনু হইয়্যান (৭২১-৮১৫ খ্রিষ্টাব্দ), বীজগণিতের (অ্যালজেব্রা) জনক মূসা আল খাওয়ারিযমী (৭৮০-৮৫০ খ্রিষ্টাব্দ), ক্রিপ্টোগ্রাফির (স্টাডি অব সিক্রেট রাইটিং এন্ড কোড) জনক (ওষুধের কার্যকারিতা পরিমাপকারী যন্ত্রের আবিষ্কারক) আবূ ইউসুফ ইয়াকুব ইবনু ইসহাক আল কিন্দি (৮০১-৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দ), আকাশে প্রথম উড্ডীয়মান ব্যক্তি 'আব্বাস ইবনু ফিরনাস (৮১০-৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দ), বহুবিদ্যাজ্ঞ এবং মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা বিজ্ঞানী আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনু জাকারিয়া আল রাজী (৮৬৫-৯২৫ খ্রিষ্টাব্দ), আধুনিক আলোকবিজ্ঞানের জনক হাসান ইবনু হাইসাম (৯৬৫-১০৪০ খ্রিষ্টাব্দ), বহুবিদ্যাজ্ঞ এবং মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আবূ রায়হান মুহাম্মদ ইবনু আহমদ আল বিরুনী (৯৭৩-১০৪৮ খ্রিষ্টাব্দ), আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথিকৃত ও চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক ইবনে সিনা (৯৮০-১০৩৭ খ্রিষ্টাব্দ) প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত মুসলিম মনীষী ও বিজ্ঞানীগণ গোটা বিশ্বকে বিস্ময়াবিষ্ট করেছে। তাঁদের প্রজ্বলিত আলোতে পৃথিবী আজও জ্যোতির্ময়।

কালের পরিক্রমায় শিক্ষাক্ষেত্রে বিভক্তি এসেছে। একমুখী শিক্ষার পরিবর্তে বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ও প্রসার ঘটেছে। এখন কেউ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে উল্লসিত হতে পাঠশালায় যায় না। এখন ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, বিজ্ঞানী, চাকরিজীবী, শিক্ষক, ইমাম-খতীব, দাঈ' সকলের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন, বিদ্যার্জনের মাধ্যমে রুজি-রুটির ফায়সালা নিশ্চিত হওয়া। পিতা-মাতা অভিভাবকগণও সেই চিন্তায় পেরেশান। মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতগণ ইমাম-খতিব, দাওয়াতি কাজ কিংবা শিক্ষকতাকে রুজি-রুটির ফয়সালা হিসেবে বেছে নিচ্ছেন এবং সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতগণ তাদের সাবজেক্ট রিলেটেড পেশায় নিয়োজিত হচ্ছেন। পার্থক্য কেবল ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিতগণ নৈতিকতার মানদণ্ডে তুলনামূলক এগিয়ে।

শিক্ষার ইসলামীকরণ : শিক্ষার মূল উৎস ওয়াহী। যতদিন এই মর্ত্যধামে মনুষ্যজীবের অস্তিত্ব থাকবে, ততোদিন পর্যন্ত ওয়াহীর বিদ্যা যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে। কেননা ওয়াহীর বিদ্যা কেবল 'ইবাদত ও মুআমালাতে সীমাবদ্ধ নয়; বরং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় পরিব্যাপ্ত। সুতরাং বস্তুবাদ, ভাববাদ, সংশয়বাদ, অজ্ঞেয়বাদ, নাস্তিক্যবাদ, যুক্তিবাদ, অভিজ্ঞতাবাদ এবং আদর্শ বিবর্জিত শিক্ষা ব্যবস্থা বর্জন করে পুনরায় ওয়াহীর বিদ্যা অন্বেষণ ও অর্জনে মনোনিবেশ করলে আধ্যাত্মিক সংকট যেমন দূরীভূত হবে, তদরূপ দেশ সমাজ ও জাতি আলোকিত গন্তব্য খুঁজে পাবে। ❑

মৃত্যুর বৃত্তান্ত

–আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ*

[পর্ব- ০২]

মৃত্যুর যন্ত্রণা : মৃত্যু একটি যন্ত্রণাদায়ক বিষয়, চিরপরিচিত এই পৃথিবী ও তার মাঝের সবকিছুকে চিরতরের জন্য ছেড়ে যেতে হবে। ছেড়ে যেতে হবে আদরের স্ত্রী-পূত্র-কন্যাসহ প্রিয় মানুষগুলোকে। তাছাড়া দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর ক্রিয়া যখন বন্ধ হয়ে যাবে তখন তো এমনিতেই এক অসহনীয় যন্ত্রণা অনুভূত হবে। তার উপর "শাকারাতুল মাউত" তথা মৃত্যু যন্ত্রণা তো আছেই। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ﴾

অর্থাৎ- "মৃত্যু যন্ত্রণা সত্যিই আসবে যা থেকে তোমরা সকলেই বাঁচতে চাচ্ছো।"[৪৭]

এ মৃত্যু যন্ত্রণা সকলের জন্য সমান বেদনাদায়ক নয়। প্রত্যেকের কর্মানুপাতে মৃত্যু যন্ত্রণা অনুভূত হয়। আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন– মৃত্যুর সময়ে মালাকুল মাউতের একটি থাবা এক হাজার তলোয়ারের আঘাত হতেও কঠিন অনুভূত হয়।[৪৮] ইবনু আবি শাইবাহ্, ইবনু আবিদ্ দুনিয়া এবং ইমাম আহমদ প্রমুখ জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন– তোমরা বানী ইসরাঈলের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করো। কেননা, সেখানে তোমাদের জন্য অনেক চমকপ্রদ শিক্ষা রয়েছে। এরপর নবীজি নিজেই সে জাতির কিছু ঘটনা বর্ণনা করতে শুরু করলেন, বানী ইসরাঈলের একটি দল একদা একটি কবরস্থানের নিকট এসে পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, আমরা দু'রাকআত সালাত আদায় করে মহান আল্লাহর কাছে মিনতি করব, তিনি যেন কবর হতে কোনো একজনকে উঠিয়ে আমাদের মুখোমুখি করার ব্যবস্থা করে দেন, তাহলে আমরা তার নিকট থেকে মৃত্যুর অবস্থা জেনে নিতে পারব। যদি আমরা এ কাজটি করতে পারি তাহলে তা আমাদের জন্য অনেক উপকারী হবে। তারপর যা ইচ্ছা তারা তাই করল। একজন কালো বর্ণের মূর্দা কবর থেকে উঠে এলো। লোকটির কপালে সিজদার নিশান ছিল। সে বলল– তোমরা আমার কাছে কি জানতে চাও? একশ বছর পূর্বে আমার মৃত্যু হয়েছে কিন্তু এখন পর্যন্ত আমি মৃত্যুর তিক্ত বিভীষিকা ভুলতে পারিনি। তোমরা আমার জন্য মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করো তিনি যেন আমাকে পূর্বের মতো করে দেন (আর যেন মৃত্যু না দেন)। অন্য একটি বর্ণনায় আছে– শাদ্দাদ ইবনু আউস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– কোনো লোককে করাত দ্বারা চিড়ে ফেললে অথবা কাঁচি দ্বারা টুকরো টুকরো করলে কিংবা কোনো পাত্রের মধ্যে ঢাকনা বন্ধ করে সিদ্ধ করলে যেরূপ যন্ত্রণা অনুভূত হয় মৃত্যুর যন্ত্রণা তারচেয়েও আরো অনেক বেশি।[৪৯] মৃত্যুর যন্ত্রণা সেই ব্যক্তিই ভালো জানেন যিনি আসলে মৃত্যুবরণ করেছেন। মৃত্যুর সময় আত্মা প্রত্যেক শিরা-উপশিরা এবং সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে বের হয়ে আসে। তলোয়ার দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করা এবং ক্ল্যাম্প দিয়ে আঘাত করার চেয়ে মৃত্যু আরো মারাত্মক, কারণ তলোয়ার দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করলে বা ক্ল্যাম্প দিয়ে আঘাত করলে যে ব্যথা পাওয়া যায় তা আত্মাসহ উপলব্ধি করে। আর মৃত্যুতে তো সে আত্মাই বিদায় নেয়। দেহের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাহায্যে সে যখন চিৎকার করতে আহ্বান জানায় তখন তার এতটুকু শক্তি থাকে না যে, সে চিৎকার করবে, চিৎকারও তার কণ্ঠে আটকা পড়ে যায় এবং তার কান্নাকাটি ব্যথার তীব্রতায় বাধাগ্রস্ত হয়। যন্ত্রণার এমন পর্যায়ে পৌঁছে সে পুরোপুরি ক্লান্ত হয়ে পড়ে, চিৎকার করার শক্তিও তার আর থাকে না।[৫০]

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মৃত্যু যন্ত্রণা : বিশ্বের সর্বকালের সর্ব শ্রেষ্ঠ মানুষ হচ্ছেন বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। তিনিও মৃত্যু যন্ত্রণা অনুভব করেছেন। উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন– রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-

---

* *প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, জা'মেআ দারুল ক্বোরআন, ঢাকা, বাংলাদেশ।*

[৪৭] *সূরা ক্বাফ : ১৯।*

[৪৮] *শরহুস্ সুদুর- ২০।*

[৪৯] *ইয়াহইয়াউল উলুম- ৩৯৪/৪।*

[৫০] *ইহইয়া উলুমুদ্দীন- ৪/৪৬১-৬২।*

এর মৃত্যুকালীন সময়ে তাঁর মাথা আমার থুতনী ও গলদেশের মাঝখানে ছিল। এমন সময় আমার ভাই আব্দুর রহমান সেখানে উপস্থিত হন। তার হাতে কাঁচা মিসওয়াক দেখে রাসূল (ﷺ) সেদিকে তাকালেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি তাঁর আগ্রহ বুঝতে পেরে তাঁর অনুমতি নিয়ে মিসওয়াকটি চিবিয়ে নরম করে তাঁকে দিলাম। তিনি সুন্দরভাবে মিসওয়াক করলেন ও পাশে রাখা পাত্রে হাত ডুবিয়ে মুখ ধৌত করলেন। এ সময় তিনি বলতে থাকেন–

«لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ».

অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই। নিশ্চয় মৃত্যু যন্ত্রণা অনেক কঠিন।"[৫১]

অন্য বর্ণনায় এসেছে– 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, যখন তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে এলো, তখন তাঁর মাথা ছিল আমার রানের উপর, তিনি বেঁহুশ হয়ে গেলেন। তারপর হুঁশ ফিরে এলো। তখন তিনি উপরের দিকে তাকিয়ে বললেন–

«اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الْأَعْلَى».

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! হে সর্বোচ্চ বন্ধু! আর এটাই ছিল তাঁর শেষ কথা।[৫২]

উপরোক্ত দুই বর্ণনার সমন্বয় এটা হতে পারে যে, 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র থুতনী ও গলদেশের মাঝখানে থাকা অবস্থায় রাসূল (ﷺ)-এর মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হলে তিনি তাঁকে স্বীয় রানের উপর শুইয়ে দেন এবং তখন রাসূল (ﷺ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন– অতঃপর আমি তাঁর মাথা বালিশে রাখি এবং অন্যান্য মহিলাদের সাথে কাঁদতে কাঁদতে উঠে আসি।[৫৩]

রাসূল (ﷺ)-এর মৃত্যু যন্ত্রণা ছিল নাম মাত্র।

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন– রাসূল (ﷺ)-এর মৃত্যু যন্ত্রণা দেখার পর হতে আমার আর কোনো ঈর্ষা হয় না। অন্য কোনো ব্যক্তির সহজ মৃত্যু হলে।[৫৪] তাঁর মৃত্যু যন্ত্রণা দেখার পর আমি আর অন্য কারো মৃত্যু যন্ত্রণাকে খারাপ মনে করি না।[৫৫] সাবেত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূল (ﷺ) যখন মৃত্যু যন্ত্রণা অনুভব করছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন– অন্য কোনো বিষয়ের জন্য নয়, মানুষ যদি শুধু মৃত্যু যন্ত্রণার কথা ভেবে 'আমল করে তাহলেই তার জন্য যথেষ্ট।[৫৬]

ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর মৃত্যু যন্ত্রণা : ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর ঘটনা থেকে জানা যায়, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে জিজ্ঞাসা করেন– হে আমার বন্ধু! আপনি মৃত্যুকে কেমন পেয়েছেন? উত্তরে তিনি বলেন– মৃত্যু যেন গরম শিকের মধ্যে লাগানো ভিজা পশমের মতো। তারপর তাকে টেনে বের করা হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন– হে ইব্রাহীম! আমি আপনার জন্য মৃত্যু যন্ত্রণা সহজ করে দিয়েছি।

ইবনু আবি মালিকা বর্ণনা করেন, যখন ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) মারা গেলেন তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ইব্রাহীম! আপনি মৃত্যুকে কিভাবে পেলেন? তিনি বললেন– আমি তো কষ্টের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলাম আর বলা হয়েছিল, আমরা আপনাকে হারিয়েছি।

মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর মৃত্যু যন্ত্রণা : মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর "রুহ্" যখন আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার দরবারে হাজির হয় তখন আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে জিজ্ঞাসা করেন, হে মূসা! আপনার কাছে মৃত্যু কেমন লেগেছে? তিনি বলেন– আমার কাছে মৃত্যুকে এমন মনে হয়েছে যেন জীবিত পাখিকে গরম তপ্ত পানির পাতিলে ফেলে সিদ্ধ করা হচ্ছে। পাখিটি মরে না, মরলে আরাম পেত এবং মুক্তি পায় না, পাইলে উড়ে চলে যেত। অন্য এক বর্ণনায় আছে– আমার কাছে মৃত্যুকে কসাই কর্তৃক জীবন্ত ভেড়ার চামড়া খোলার মতো কষ্টদায়ক মনে হয়েছে। অন্য আরো একটি বর্ণনায় এসেছে– মূসা (আলাইহিস সালাম) উত্তরে বলেছেন– হে পরওয়ারদেগার! পশম ও তুলোর মধ্যে অনেকগুলো কাঁটা বিধলে তা তোলার সময় যে ধরনের কষ্ট বোধ হয়, মৃত্যু যন্ত্রণা আমার কাছে অনেকটা সে রকম অনুভূত হয়েছে।[৫৭]

---

[৫১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪৪৪৯।*
[৫২] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৩৪৮।*
[৫৩] *ইবনু হিসাম- ২/৬৫৫।*
[৫৪] *সুনান আন্ নাসায়ী।*
[৫৫] *সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৮৩৩।*
[৫৬] *যাওয়ায়েদে যুহদ।*
[৫৭] *ইয়াহইয়াউল উলুম।*

আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র মৃত্যু যন্ত্রণা : আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র যখন মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হয় তখন তিনি তাঁর কন্য উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে কাছে ডাকলেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর বাবার কাছে এসে যখন তাঁকে দেখলেন তিনি মূর্ছিত হয়ে যাচ্ছেন তখন তাঁর মুখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটি কবিতাংশ উচ্চারিত হলো–

إِذَا حَشْرَجَتْ يَوْمًا وَضَاقَ بِهَا الصَّدْرُ.

অর্থাৎ- আত্মা একদিন অস্থির হবে এবং বক্ষ সংকুচিত হয়ে যাবে।

(তাফসীরে ইবনু কাসীরে এসেছে–) 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তখন এই ছন্দটি পাঠ করছিল–

من لا يزال دمعه مقنعا - فانه لا بد مرة، مدفوق.

অর্থাৎ- যার অশ্রু থেমে আছে, ওটাও একবার টপ টপ করে পড়বে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার প্রতি আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র আস্থা ছিল অত্যাধিক, ঈমানের উপর তিনি ছিলেন সুদৃঢ়। ধৈর্য ধারণে তিনি ছিলেন অনুস্মরণীয়। তাইতো এ বিপদ মুহূর্তেও তিনি 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে থামিয়ে দিয়ে বলেন– তুমি বৃথাই কবিতা পাঠ করছ, এটা না করে তুমি কুরআনুল কারীমের এ আয়াতটি পাঠ করছো না কেন? আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেছেন–

﴿وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ﴾

অর্থাৎ- "মৃত্যু যন্ত্রণা অবশ্যই আসবে তা থেকে পালানোর জন্য তুমি যতই টালবাহানা করো না কেন?"[৫৮]

'আম্র ইবনু 'আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র মৃত্যু যন্ত্রণা : 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র ইবনু 'আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, আমার পিতা ['আম্র ইবনু 'আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] প্রায়ই বলতেন, ওই ব্যক্তি সম্পর্কে আমার বড়ই আশ্চার্যবোধ হয়, যার মধ্যে মৃত্যুর আলামত প্রকাশ পেয়েছে। তার হুঁশ এবং অনুভূতি বিদ্যমান আছে, বাক শক্তি নষ্ট হয়নি। এতদ্সত্ত্বেও সে কেন মৃত্যুর অবস্থা বর্ণনা করে না? ঘটনাক্রমে 'আম্র ইবনু 'আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, তখনও তাঁর হুঁশ, অনুভূতি ও বাকশক্তি বিদ্যমান। আমি তাঁকে বললাম, হে আমার পিতা! এ অবস্থায় উপনীত ব্যক্তি মৃত্যুর অবস্থা বর্ণনা না করার উপর তো আপনি আশ্চার্যবোধ করতেন। আজ আপনি মৃত্যুর অবস্থা কিছু বর্ণনা করুন! 'আম্র ইবনু 'আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উত্তরে বললেন, হে বৎস! মৃত্যুর অবস্থা তো বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তারপরও আমি কিছু বর্ণনা দিচ্ছি, আল্লাহর শপথ! আমার মনে হচ্ছে যে, আমার কাঁধের উপর পাহাড় রাখা হয়েছে এবং মনে হচ্ছে আমার প্রাণ সুঁচের ছিদ্র দ্বারা বাহির করা হচ্ছে এবং আমার পেট যেন কাঁটায় ভরপুর। আমার মনে হচ্ছে আসমান-জমিন একত্রে মিশে গেছে। আর আমি এটার মাঝে পিষ্ট হয়ে যাচ্ছি। এই হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা যাদের উপর সন্তুষ্ট এরকম একজন মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবীর মৃত্যুকালীন সময়ের অনুভূতি। যা তিনি নিজে অনুভব করেছেন। তাঁর ছেলে 'আব্দুল্লাহ তা বর্ণনা করেন।[৫৯]

শহীদগণের মৃত্যু যন্ত্রণা : আবূ ক্বাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, পিঁপড়ার কামড়ের কারণে যতটুকু কষ্ট বোধ হয় একজন শহীদ মৃত্যুর সময় অনেকটা সে রকম কষ্টবোধ অনুভব করবে।[৬০]

মু'মিনদের মৃত্যু যন্ত্রণা : মু'মিনগণও মৃত্যু যন্ত্রণা অনুভব করে। দুনিয়া ও আখিরাতে মু'মিনদের যতপ্রকার দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণা আছে তন্মধ্যে মৃত্যু যন্ত্রণা অতিভীষণ। ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূল (ﷺ) বলেছেন– মু'মিনের আত্মা তার ঘামের সাথে বের হয়ে যায়। আর গাধাকে যে ভাবে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয় ঠিক তেমনি কাফিরের আত্মা টেনে বের করা হয়। মু'মিনের করা পাপগুলোর প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু যন্ত্রণার মাধ্যমে হয়ে যায়।[৬১] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (ﷺ) বলেছেন– মু'মিনের প্রতিটি বিষয়ের মাঝে শুধু বিনিময় আর বিনিময় রয়েছে। এমনকি তার মৃত্যুর যন্ত্রণার মাঝেও সে প্রতিদান পেয়ে থাকে।[৬২] রাসূল (ﷺ) আরো বলেন–

[৫৮] *সূরা ক্বাফ : ১৯; তাফসীরে মারেফুল কুরআন- পৃ. ১২৯০।*

[৫৯] *তাবাকাত ইবনু সা'দ।*
[৬০] *তাবারানী।*
[৬১] *আবূ নায়ীম, তিবরানী কাবির।*
[৬২] *সুনানে ইবনু মাজাহ্।*

مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيْبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا حَزَنٍ وَلَا وَصَبٍ حَتَّى الْهَمِّ يَهُمُّهُ إِلَّا يُكَفِّرُ اللهُ بِهِ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ.

অর্থাৎ- মু'মিন ব্যক্তির উপর যে দুঃখ-কষ্ট, দুশ্চিন্তা-রোগ, এমনকি সামান্য একটু দুশ্চিন্তা হলেও আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা এর বিনিময়ে তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন।[৬৩]

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা যখন তার কোনো বান্দার উপর অনুগ্রহ করতে ইচ্ছা করেন তখন তিনি সে যে পরিমাণ গুনাহ করেছে তার পরিবর্তে তাকে রোগাক্রান্ত করেন, তার ঘরে বিপদ নাযিল করেন এবং তার রুজি কমিয়ে দেন, যেন তা দ্বারা তার গুনাহসমূহের কাফ্ফারা হয়ে যায়। তারপরও যদি তার কোনো গুনাহ বাকি থাকে তবে মৃত্যু যন্ত্রণা তার উপর কঠোর করে দেন। যদি সে তাতে ধৈর্য অবলম্বন করতে পারে তবে সে পরকালীন বিপদ থেকে মুক্তি পাবে এবং তার কাঙ্ক্ষিত ফলাফল সে পেয়ে যাবে।[৬৪] আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত রয়েছে। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক যুবকের কাছে গেলেন। সে তখন মুমূর্ষ অবস্থায় ছিল। তিনি বললেন, তোমার কেমন লাগছে? যুবকটি বলল– আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আল্লাহর শপথ! আল্লাহর রহমতের আশা করছি, কিন্তু আমার পাপসমূহের কারণে ভয়ও পাচ্ছি। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন– এমন অবস্থায় যার হৃদয়ে বিপরীত জিনিস (ভয় ও আশা) একত্রিত হয়, অবশ্যই আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাকে তার কাঙ্ক্ষিত জিনিস দান করেন এবং বিপদ থেকে তাকে মুক্ত রাখেন।[৬৫] সুতরাং মু'মিনদের উচিত মৃত্যু যন্ত্রণার ভয়ে ভীত না হয়ে পাপকে পরিত্যাগ করা, যাতে তার মৃত্যু যন্ত্রণা হাল্কা অনুভূত হয়। হাল্কা মৃত্যু যন্ত্রণা সম্পর্কে বারা বিন আযেবের দীর্ঘ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে– মু'মিন বান্দারা যখন দুনিয়া ত্যাগ করে আখিরাতে পাড়ি জমানোর সময় উপস্থিত হয়, তখন আসমান থেকে সাদা চেহারা বিশিষ্ট ফেরেশ্তা নিচে নেমে আসে। তাদের চেহারা সূর্যের মতো আলোকোজ্জ্বল। তাদের সাথে থাকে জান্নাতের কাফন ও সুগন্ধি। তারা তার চোখের সীমানায় এবং মৃত্যু ফেরেশ্তার মাথার কাছে বসেন। তখন মৃত্যু ফেরেশ্তা বলে– হে পবিত্র আত্মা! তুমি মহান আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে বেরিয়ে আসো! 'রুহ্' তখন বেরিয়ে আসবে। কলসীর মুখ থেকে যেভাবে পানির ফোঁটা বেরিয়ে আসে 'রুহ্' সেভাবেই বেরিয়ে আসবে। তখন ফেরেশ্তাগণ সে রুহ্টিকে জান্নাতের কাফন ও সুগন্ধির মধ্যে রাখবে এবং তা থেকে দুনিয়ার সর্বোত্তম মেশকের সুঘ্রাণ বের হতে থাকবে।[৬৬] তামীমুদ দারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একটি দীর্ঘ হাদীসে এসেছে– আল্লাহর শপথ! মা তার শিশুকে যতটা স্নেহ ও মমতা করে থাকে মৃত্যুর ফেরেশ্তা তার উপর তারচেয়ে বেশি স্নেহশীল ও মমতাময়ী হয়ে থাকেন। কেননা, মালাকুল মাউত জানেন যে, এই 'রুহ্' আল্লাহ তা'আলার নিকট খুবই প্রিয়। তিনি মনে করেন যে, যদি এই রুহের উপর সামান্য পরিমাণও কষ্ট হয় তবে তার প্রতিপালক তার উপর অসন্তুষ্ট হবেন। অতঃপর তিনি এমনভাবে এই 'রুহ্'কে দেহ থেকে পৃথক করে নেন যেমনভাবে খামীরকৃত আটা হতে চুল বের করে নেন।[৬৭] সুতরাং মু'মিনগণ মৃত্যুকে অপছন্দ করবে না।

কাফের-মুশরিক ও মুনাফিকদের মৃত্যু যন্ত্রণা : কাফের-মুশরিক ও মুনাফিকরা মৃত্যুর সময়ে মূর্চ্ছাতুর ব্যক্তির মতো চোখ উল্টিয়ে তাকায়। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাঁর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলেন–

﴿رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ إِلَيْكَ تَدُوْرُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِيْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾

অর্থাৎ- "তখন তুমি দেখবে যে, মৃত্যু-ভয়ে মূর্চ্ছাতুর ব্যক্তির মতো চোখ উল্টিয়ে তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে।"[৬৮] আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَلَوْ تَرٰى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الْمَلٰئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ﴾

---

[৬৩] *জামে আত্ তিরমিযী- অধ্যায় : জানাযা, পরিচ্ছেদ : ১/রোগাক্রান্ত হওয়ার ফযীলত, হা. ৯৬৯।*

[৬৪] *বায়হাকী, শু'য়াবুল ঈমান।*

[৬৫] *জামে আত্ তিরমিযী- অধ্যায় : জানাযা, পরিচ্ছেদ : মু'মিন ব্যক্তির মৃত্যুর সময় কপাল ঘামে, হা. ৯২২।*

[৬৬] *মিশকাত- পর্ব : জানাযা, পরিচ্ছেদ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ, ১৬৩০; আহমাদ- ১৮৫৩৪; ইবনু আবী শায়বাহ্- ১২০৫৯; মুস্তাদরাক লিল হাকিম- হা. ১০৭; সহীহ আত্ তারগীব- হা. ৩৫৫৮; সহীহ আল জামি' আস্ সগীর- হা. ১৬৭৬।*

[৬৭] *এ হাদীসটি খুবই গরীব। এ হাদীসের সনদে ইয়াযীদ রিকাশী অত্যন্ত দুর্বল।*

[৬৮] *সূরা আল আহ্যা-ব : ১৯; সূরা মুহাম্মদ : ২০।*

অর্থাৎ- "তুমি যদি দেখতে পেতে ফেরেশ্তাগণ কাফেরদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে প্রহার করে তাদের প্রাণ হরণ করছে এবং বলছে, তোমরা দাহনযন্ত্রণা ভোগ করো।"[৬৯]

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আরো বলেন–

﴿وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمْ﴾

অর্থাৎ- "যদি তুমি দেখতে যখন যালিমগণ মৃত্যু যন্ত্রণায় পড়বে এবং ফেরেশ্তাগণ হাত বাড়িয়ে বলবে, তোমাদের প্রাণ তোমরাই বের করে দাও।"[৭০]

বারা ইবনু 'আযেবের দীর্ঘ হাদীসটিতে বর্ণিত হয়েছে– কাফিরদের যখন দুনিয়া ত্যাগ করে আখিরাতে পাড়ি জমানোর সময় উপস্থিত হয় তখন তার কাছে কালো চেহারা বিশিষ্ট ফেরেশ্তা নাযিল হয়। তারপর মৃত্যুর ফেরেশ্তা হাযির হয় এবং তার মাথার কাছে বসে আদেশ করে, হে হীন অপবিত্র আত্মা! মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও গযবের দিকে বেরিয়ে আসো। তখন তার শরীর চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে থাকবে। ফেরেশ্তারা আত্মাকে শরীর থেকে এমনভাবে টেনে বের করবে যেমনটি ভিজা পশম থেকে বাঁকা কাঁটা বিশিষ্ট লোহা টেনে বের করা হয়। বের করার সাথে সাথে রুহ্টি একটি পশমের তৈরি কাপড়ে রাখে তা থেকে জমিনের সবচাইতে নিকৃষ্ট দুর্গন্ধ বের হতে থাকে।[৭১]

কাফেররা যদি দুনিয়াতে কোনো ভালো কাজ করে থাকে তাহলে তাদেরও মৃত্যু যন্ত্রণা সহজ করে দেওয়া হয়। হাদীসে এসেছে– কাফের ব্যক্তি যদি দুনিয়াতে কোনো পূণ্যকর্ম করে থাকে তাহলে এর বিনিময়ে তার মৃত্যু সহজ করে দেওয়া হয়। অতঃপর কুফ্রীর পরিণতি হিসেবে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়।[৭২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে– তাদের মৃত্যুর সময় মালাকুল মাউত অত্যন্ত কুৎসিত ও ভয়াবহ আকৃতিতে তার নিকট হাজির হন, এরূপ ভয়ানক আকৃতি কেউ কখনো দেখেনি। তার থাকে বারোটি চোখ এবং সে পরিধান করে জাহান্নামের কাঁটাযুক্ত পোশাক। তার সাথে থাকে পাঁচশতজন ফেরেশ্তা। তারা সাথে করে নিয়ে আসেন আগুনের আঙ্গার এবং আগুনের চাবুক। মালাকুল মাউত রুহ্ কবজের সময় তার পরিধেয় পোশাক (যা জাহান্নামের আগুনের কাঁটাযুক্ত) দিয়ে তার দেহের উপর প্রহার করেন। তার প্রতিটি লোমকূপে ঐ আগুনের কাঁটা প্রবেশ করে। তারপর এমনভাবে ঐগুলো ঘুরতে থাকে যে, তার দেহের জোড়াগুলো পৃথক হয়ে যায়। অতঃপর তার রুহ্ তার পায়ের নখ দিয়ে টেনে বের করা হয়। এরপর রুহ্ আবার নিক্ষেপ করা হয় তার পায়ের গোড়ালীর উপর। এ সময়ে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে তখন ফেরেশ্তা তাদের আনিত আগুনের আঙ্গার ও আগুনের চাবুক দিয়ে তার চেহারা ও পিঠের দিকে মারে। তাকে শক্ত করে বেঁধে তার রুহ্ তার পায়ের গোড়ালীর দিকে থেকে টেনে বের করা হয়। তারপর তা আবার তার হাঁটুর উপর নিক্ষেপ করা হয়। তার অবস্থা আবার পূর্বের মতো হয়, পূর্বের মতো তাকে আবার প্রহারও করা হয়। শেষ পর্যন্ত তার 'রুহ্' বক্ষের উপর উঠে যায়, তারপর গলার উপর চলে যায়। এভাবেই তার 'রুহ্' কবজ করা হয়।[৭৩]

ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, মালাকুল মাউত কাফেরদের 'রুহ্' কবজ করার সময় রুহ্টি লোকাতে থাকে একেক করে প্রতিটি চুলের নিচে, নখ ও পায়ের গোড়ায়। মালাকুল মাউত সব জায়গা থেকে রুহ্ কবজ করেন। এমনকি যদি কোনো প্রতিক্রিয়া তার দেহে অবশিষ্ট থাকে তিনি তার থেকে তাও বের করে নেন।[৭৪] তাদের মৃত্যু যন্ত্রণা সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) হতে অসংখ্য হাদীস ও সাহাবায়ে কিরাম হতে বেশ কিছু মূল্যবান বাণী বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে আরো জানতে হলে "শরহুস্ সুদূর" ও ইমাম গাযালী'র "ইয়াহইয়াউল উলুম" গ্রন্থদ্বয় পাঠ করা যেতে পারে।

[চলবে ইন্শা-আল্লাহ]

---

[৬৯] *সূরা আল আনফাল : ৫০।*

[৭০] *সূরা আল আন'আম : ৯৩।*

[৭১] *মিশকাত- পর্ব : জানাযা, পরিচ্ছেদ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ, হা. ১৬৩০; আহমাদ- ১৮৫৩৪; ইবনু আবী শায়বাহ্- ১২০৫৯; মুস্তাদরাক লিল হাকিম- হা. ১০৭; সহীহ আত্ তারগীব- হা. ৩৫৫৮; সহীহ আল জামি' আস্ সগীর- হা. ১৬৭৬।*

[৭২] *ইবনু আবী দুনিয়া।*

[৭৩] *এ হাদীসটি খুবই গরীব। এ হাদীসের সনদে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র পর ইয়াযীদ রিকাশী অত্যন্ত দুর্বল।*

[৭৪] *বগভী (সূরা আন্ নাযি'আতু ঘারক্বা'-এর তাফসীর দেখুন)।*

নফস : মানুষের আত্মশত্রু ও শয়তানের বন্ধু

–মো. হারুনুর রশিদ★

[পর্ব- ০২]

নফসের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার ৩য় 'আমল– আল্লাহ তা'আলা আমাকে দেখছেন : "সর্বদা আল্লাহ তা'আলা আমাকে দেখছেন" –এ মানসিকতা অন্তরে বদ্ধমূল রাখা, বিশেষ করে 'ইবাদতের ক্ষেত্রে। এ বিষয়টির প্রতি হাদীসে জিব্‌রাঈলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। জিব্‌রাঈল (আলাইহিস সালাম) যখন রাসূল (ﷺ)-কে বললেন, আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন, তখন উত্তরে রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন,

«أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ».

অর্থ : (ইহসান হলো–) তুমি এমনভাবে মহান আল্লাহর 'ইবাদত করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছো। যদি তাঁকে দেখতে না পাও, তাহলে তিনি তো তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন।[৭৫]

এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। বিশেষ করে একাকিত্বের সময়গুলোতে। আমাদের মনে যদি এই ধারণা বদ্ধমূল থাকে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের দেখছেন, তাহলে আমাদের পক্ষে গুনাহ করা কঠিন হয়ে যাবে।

আপনারা সবাই সেই বিখ্যাত ঘটনার কথা জানেন, যেখানে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) জিহাদে গিয়েছিলেন আর কিছু সাহাবা পিছনে পড়ে গিয়েছিল তাদের সাথে ছিল মুনাফিক্বরাও। এরপর যখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ফিরে আসলেন, তখন মুনাফিক্বরা তাদের ইচ্ছামত বাহানা পেশ করতে লাগল। তিনজন সাহাবা বাদে। তাঁরাও কিন্তু পারতেন, যে কোনো একটা বাহানা বানাতে, কিন্তু তাঁদের মধ্যে এই চিন্তা ছিল যে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের দেখছেন। আল্লাহ তা'আলা তো অন্তরের খবর পর্যন্ত জানেন? আমরা কিভাবে আল্লাহ তা'আলা কে ধোঁকা দেব? এই ব্যাপারটা আমাদের মাথায় থাকলে ইন্‌শা-আল্লাহ আমাদের গুনাহ কমে যাবে সাথে সাথে আমাদের কাজেও গতিশীলতা আসবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে– এটা আমরা কিভাবে অর্জন করব? এটার একটা সহজ উপায় হচ্ছে, সালাত।

আমরা সবাই সেই হাদীসটা জানি, যেখানে বলা হয়েছে এমনভাবে সালাত আদায় করো যেন আল্লাহ তা'আলা তোমাকে দেখছেন না হয় তুমি মহান আল্লাহকে দেখছো। এখন আমরা যদি এই সালাতের মাঝে এটাকে অভ্যাসে পরিণত করতে পারি। তাহলে সর্বাবস্থায় এটা সহজ হবে।

উলামাগণ বলেছেন, পাঁচ প্রকার নামাযি আছে আর তাদের পাঁচ প্রকার ফলাফল আছে।

(১) যে মাঝে মাঝে সালাত আদায় করেন, মাঝে মাঝে বলতে প্রতিদিন দুই এক ওয়াক্ত আদায় করেন। এমনটা দীর্ঘ দিন আদায় করেন না।-এদের পরিণাম হচ্ছে জানান্নাম (আল্লাহ তা'আলা তার অনুগ্রহে মাফ করলে ভিন্ন)।

(২) যে নিয়মিত সালাত আদায় করে, কিন্তু সালাতে খুশু খুযু নেই, যে খুশু খুজু আনার চেষ্টাও করেনা, কারো কাছে শিখেও না। –এরা সালাত না আদায় করার গুনাহ থেকে বেঁচে যাবে। কিন্তু এদের সালাত এদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করবে না। মানে ঐ অবস্থায় আসবে না, "নিশ্চয়ই সালাত বিরত রাখে সকল অন্যায় ও লজ্জাজনক কাজ থেকে"। এটা এদের মধ্যে আসবে না।

(৩) এরা নিয়মিত আদায় করে, শয়তান এদের সালাতে ধোঁকা দেয়। এর পরেও এরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করে। সালাতে একনিষ্ঠভাবে থাকে।

(৪) এই অবস্থায় এসে শয়তান ব্যর্থ হয়ে ধোঁকা দেয়া ছেড়ে দেয়।

(৫) এটা আম্বিয়াদের সালাত। সেই হাদীসটা আছে না? সূরা আল ফাতিহার দু'টা অংশ, একটা বান্দার জন্য একটা মহান আল্লাহর জন্য। এটা তারা অনুভব করতে পারেন।

এখন যে ব্যক্তি নিয়মিত সালাত আদায় করবে এবং সালাত পরিশুদ্ধ করতে চাইবে, এই 'আক্বিদাহ্ রাখবে

★ *ফারাক্কাবাদ, বিরল, দিনাজপুর;* ***মেম্বার :*** *Qur'an Research Foundation।*

[৭৫] *সহীহ মুসলিম- হা. ১/৮।*

যে আল্লাহ তা'আলা আমাকে দেখছেন। আস্তে আস্তে সে ৩ থেকে ৪ এ আসবে। আসলে ৩ থেকেই সে সেই আয়াতের ফযীলত পাবে যে সালাত তাকে বিরত রাখবে সব মন্দ কাজ থেকে। যে এভাবে চেষ্টা চালাবে, শয়তান ওয়াসওয়াসা দিলেও সালাত এ দাঁড়িয়ে থাকবে, একসময় তার এই সালাত অভ্যাসে পরিণত হবে, যেমন- আমরা ভাত খাই এটা আমাদের অভ্যাস।

দেখবেন যে অনেক দিন টানা একটা 'ইবাদত করলে সেটা না করলে আপনার ভালো লাগবে না। ঘুম আসবে না। তখন বুঝবেন এটা আপনার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এরপর অভ্যাস থেকে সেটা 'ইবাদতেও রূপ নেবে। তখন গিয়ে আপনি সেই মন জুড়ানো মুহূর্ত অনুভব করতে পারবেন। আপনার মনে হবে যে আল্লাহ তা'আলা আমার সামনে আছেন তখন আপনি চাইলেও ফাঁকি দিতে পারবেন না।

একবার ভাবুন তো যদি আপনার পেছনে রাসূল (ﷺ) সালাত আদায় করে বা আপনি সালাত আদায় করছেন আপনাকে তিনি দেখছেন, তাহলে আপনার সালাতে কি মনোযোগ আসবে? সিজদাহ্গুলো কেমন হবে? রুকূ'গুলো?

তাহলে চিন্তা করি যে আল্লাহ তা'আলা আমাদের সব সময় দেখছেন, কিভাবে আমরা গুনাহ করতে পারি? একজন মানুষ দেখলে যদি আমাদের মধ্যে এই অনুভূতি আসে, সেখানে যিনি অন্তরের খবর পর্যন্ত জানেন সেখানে আমাদের ইখলাস কেমন হওয়া উচিত? এভাবে যখন আমরা এটা 'ইবাদতে পরিণত করব তখন সালাতের বাইরেও আমাদের সেটা অভ্যাসে পরিণত হবে। আমাদের জন্য গুনাহ করা শক্ত হয়ে যাবে। কাজেই আমরা আমাদের সালাতের ব্যাপারে যত্নবান হই, এই রাতগুলোকে কাজে লাগাই, নফল সালাতের পরিমাণ বাড়িয়ে দেই।

সালাতে মনোযোগ ধরে রাখার কিছু টিপস :

১. আযান হবার সাথে সাথে দুনিয়াবি সকল কাজ বন্ধ করার চেষ্টা করতে হবে। আযান হলেই দেখা যেত সাহাবারা একে অপর কে চিনতেন না।

২. এরপর একটু মাথাকে শান্ত রাখি।

৩. ওযূর করার সময় সুন্নাহের ব্যাপারে খেয়াল রাখি। খুব ভালোভাবে সময় নিয়ে ওযূ করি।

৪. স্বাভাবিক অবস্থায় অবশ্যই আমরা মসজিদে যাব।

৫. ওযূর সাথে মেশওয়াক করব।

৬. বাসায় হলে আমরা আযান দিতে পারি।

৭. সালাতে তিলাওয়াত, রুকূ', সিজদার ব্যাপারে যত্নবান হই।

৮. সালাতের শেষের যিক্রগুলো করি।

৯. সুন্নাহগুলো ঠিক মতো আদায় করি, এমন যেন না হয় সালাত আমার জন্য বোঝা তাই আদায় করছি; বরং এমন মনে করি এটা আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার সাথে কথা বলার মাধ্যম, আর অন্যতম জরুরি বিষয় হচ্ছে দু'আ করা।

নফসের কুমন্ত্রণা থেকে বাচার ৪র্থ 'আমল– সকল স্বাদ বিনষ্টকারী মৃত্যুর স্মরণ : যে কোনো মুহূর্তে আমার মৃত্যু আসতে পারে, এ বিশ্বাস অন্তরে মজবুত রাখা। গুনাহের অবস্থায় মৃত্যু বরণ করলে কী ভয়াবহ পরিণতি হবে? এ ভয় সর্বদা অন্তরে জাগ্রত রাখা। এ সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾

অর্থ : "পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশি থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত।"[৭৬]

মৃত্যুর 'আক্বিদাহ্ অন্তরে বুলন্দ করে নিতে হবে আমাদের। আমাদের যেন এই বিশ্বাস চলে না আসে যে, আমরা যেহেতু জিহাদের দাওয়াহ দেই, চেষ্টা করি সাথে আছি, আমাদের মৃত্যু জিহাদের ময়দানেই হবে, সুবাহান আল্লাহ, আর আমরা মাফ পেয়ে যাব, অনেক সময় দেখবেন শয়তান এই ওয়াসওয়াসা দেবার চেষ্টা করবে। কারন শয়তানের একটা উপায় হচ্ছে যে, আপনাকে নেক সুরুতে ধোঁকা দেবে।

প্রথমেই সে আপনাকে দিয়ে বড় কোনো গুনাহের কাজ করাবে না; বরং সে আপনার মধ্যে ফ্যান্টাসি তৈরি

[৭৬] *সূরা আন্ না-যি'আ-ত : ৪০-৪১।*

করবে জিহাদ নিয়ে। আমি তো মুজাহিদ আমার অন্য 'আমলের তেমন দরকার নেই। ভাই এমন খেয়াল মনে আসলেই আমাদের সাথে সাথে ইস্তেগফার পড়তে হবে, কত মানুষই তো জিহাদ করেছে অথচ তাদের বিছানায় মৃত্যু হয়েছে, আর আমরা তো ময়দানেও নেই, আল্লাহ তা'আলা আমাদের হিফাযত করুক।

তাই মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করা। কেননা মৃত্যু হচ্ছে সুখ শান্তি বিনষ্টকারী, আমরা যদি কুরআন এর ধারাবাহিক আয়াত নাযিলের কথা খেয়াল করি তাহলে দেখব প্রথমে জান্নাত, জাহান্নাম, মৃত্যু এই আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে, এরপর হুকুম আহকামগুলো নাযিল হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে আগে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা মু'মিনদের অন্তরগুলোকে এগুলো গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করেছেন। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) একদিন ময়লার স্তূপের কাছে নিয়ে গেলেন, এরপর বললেন এটা হচ্ছে দুনিয়া, ভাই আমাদের দুনিয়ার জীবন তো অস্থায়ী। সাহাবারা কেনো নিজেদের সব কিছুকে মহান আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিতেন? কারণ তাদের মধ্যে এই 'আক্বিদাহ্ বদ্ধমূল ছিল যে, আমরা এই অস্থায়ী জীবন ছেড়ে একদিন চলে যাব, স্থায়ী জীবনের দিকে, সেটা হচ্ছে আখিরাত।

আমরা যখন এটা মনে রাখব যে, একদিন আমাদের মৃত্যু হবে, রবের সামনে দাঁড়াতে হবে। তাহলে আমাদের জন্য গুনাহ করা কঠিন হবে, যদি আমরা বর্তমান পরিস্থিতির দিকেই নজর দেই, তাহলে আমরা দেখব এই করোনার ভয়ে কত মানুষ মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছে। মৃত্যু সত্যি সুখ শান্তি বিনষ্টকারী।

আমরা প্রতিদিন বারবার মনে করব যে, আমাদের একদিন মৃত্যু হবে, এতে আরো একটি ফায়দা হচ্ছে। আমাদের মধ্যে থাকা ভিরুতা চলে যাবে, অনেকেই জিহাদের বিরোধিতা করে, কারণ কি? অন্যতম কারণ হচ্ছে জিহাদের কথা বললে আপনাকে তাগুত অত্যাচার করবে। আপনাকে হত্যা করবে।

যখন আমাদের মনে এই বিশ্বাস থাকবে যে, আমরা তো একদিন মারা যাব। তাহলে কেনো আমরা আল্লাহ তা'আলা ব্যতিত অন্য কাউকে ভয় পাবো? আল্লাহ তা'আলা আমাদের বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করার তাওফীক্ব দান করুক। আমরা বেশি বেশি দুয়া করব যেন আমাদের মৃত্যু এমন অবস্থায় হয় যে, আল্লাহ আমাদের উপর রাজি।

আর একটা ব্যাপার দেখবেন যে, মানুষ বেশি বেশি যে কাজটা করে, যে কাজে সে সব সময় অভ্যস্ত। মৃত্যুর সময় তার কাজ কর্মে সেটাই প্রকাশ পায়, কাজেই আমরা যদি এখন মহান আল্লাহর সাথে সৎ না হই, গুনাহ ত্যাগ না করি, আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর যে দায়িত্ব দিয়েছেন, তা আনজাম না দেই। তাহলে কিভাবে আশা করব যে আমাদের মৃত্যু মহান আল্লাহর রাস্তায় হবে? আফসোস, আমি কতোটা গাফেল!

মৃত্যুকে স্মরণ করার অন্যতম উপায় হচ্ছে, কবরস্থানে যাওয়া। আমরা বেশি বেশি কবর যিয়ারত করব। এ ব্যাপারে হাদীস ও রয়েছে–

"আমি তোমাদের আগে কবর যিয়ারতে নিষেধ করেছিলাম, এখন থেকে কবর যিয়ারত করো। কেননা তা দুনিয়াবিমুখতা এনে দেয় এবং আখিরাতের স্মরণ করিয়ে দেয়।"[৭৭]

সুবহানাআল্লাহ, আমরা এই এটাকে আমাদের কর্তব্য হিসেবে ধরে নেই, যে আমরা মাঝে মাঝেই কবর যিয়ারতে যাব।

আর একটা উপায় হচ্ছে– অসুস্থকে দেখতে যাওয়া, হসপিটালে যাওয়া, প্রতিদিন কত মানুষ মারা যাচ্ছে, কত মানুষ মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত।

এসব যখন আমাদের মনে হবে তখন আমাদের মধ্যেও মৃত্যু ভয় আসবে আশা করি, হাসপাতালে না গেলে মানুষ হিসেবে আমাদের অসহায়ত্ব বুঝা মুশকিল, আমরা খুব চেষ্টা করব মসজিদে জানাযা হলে তাতে অংশ গ্রহণ করতে।

হাসপাতালে গেলে বুঝা যায় মানুষ কতোটা অসহায়। বিশেষ করে সরকারী হাসপাতালে। মানুষ যে মহান আল্লাহর মুখাপেক্ষী তা বুঝা যায়। উপলব্ধি করা যায়। যে শরীরের সুস্থতা আল্লাহ তা'আলা আমাদের দিয়েছেন, আল-হামদুলিল্লাহ। এটা আসলেই একটা নিয়ামত। এই বিষয়টা মানুষের অসহায়ত্ব দেখে উপলব্ধি হয়। *[চলবে ইন্শা-আল্লাহ]*

[৭৭] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৫৭১।*

আলোকিত জীবন

মুহাম্মাদ ইসমা'ঈল সালাফী জীবন ও কর্ম

–তানযীল আহমাদ*

পূর্বকথা : পাক-ভারত উপমহাদেশের যে কয়েকজন 'আলিমে দ্বীন নিজের মেধা, শ্রম, বুদ্ধিকে প্রবাহ করেছেন তাওহীদ ও সুন্নাহর ঝাণ্ডা উঁচু করার জন্য, যারা একাধারে দার্‌স-তাদরীস, তা'লিম, তানযীম ও তাসনীফের কাজে সফলতার উচ্চস্থরে আরোহণ করেছেন কঠোর পরিশ্রম ও চেষ্টা প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে, মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল সালাফী (রাহিমাহুল্লাহ) তাদের অগ্রজ হিসাবে ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে আলোকিত করেছেন। যারা দেশ, সমাজ ও ধর্মের কাছে সমাদৃত হয়েছেন সমভাবে তিনি তাদের উদাহরণ হিসাবেই উদিত হয়েছেন ও হবেন কালান্তরে। যারা সত্য ও ন্যয়ের কথা বলতে গিয়ে জালিমের কারাপ্রকোষ্টে নিক্ষিপ্ত হয়েও পাহাড়সম অবিচল ছিলেন, উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সম্পদ যুবশ্রেণির হৃদয়পটে ভাস্কর হয়ে রয়েছেন, তিনি তাদের অন্যতম। ক্ষণজন্মা এই মহাপুরুষই আমাদের আলোচ্য ব্যক্তি।

সালাফী (রাহিমাহুল্লাহ)'র দাদা ও পিতা : মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমা'ঈল সালাফী (রাহিমাহুল্লাহ)'র দাদাজান ছিলেন বিখ্যাত চিকিৎসক-হাকিম 'আব্দুল্লাহ (রাহিমাহুল্লাহ)। তার ছিল চার পুত্র। যথা- ১. মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম, ২. মাওলানা আহমাদ, ৩. মাওলানা 'আবদুল আযীয, ৪. মাওলানা মুহাম্মাদ আলম।

মাওলানা মুহাম্মাদ ইব্‌রাহীমই সালাফী (রাহিমাহুল্লাহ)'র গর্বিত পিতা। বংশীয় পেশা কিতাব লেখা, (সে যুগে ফটোকপি বা টাইপের প্রচলন না থাকায় বিভিন্ন কিতাব একাধিক কপি করা হত হাতেই, এটা একটা পেশায় পরিণত হয়েছিল) ও চিকিৎসাই ছিল মাওলানা মুহাম্মাদ ইব্‌রাহীমের জীবিকা নির্বাহের উপায়। আর তিনি এই কাজে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

মাওলানা আব্দুল মান্নান উযীরাবাদী (রাহিমাহুল্লাহ) ছিলেন তৎকালীন সেই অঞ্চলের বিখ্যাত আহলে হাদীস 'আলিম। তার দারসে প্রতিদিন বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিক্ষার্থীরা আসত দারস্ গ্রহণের জন্য। মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম চিকিৎসার পাশাপাশি কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান অর্জনের জন্য সেই দারসে্ হাজির হতেন। এভাবে তিনিও কুরআন-সুন্নাহ-য় বেশ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। সুতরাং চিকিৎসা, কিতাব কপি করা ও দ্বীনী 'ইলমের এক অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীমের মাঝে।

ইবরাহীম সাহেব ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী। আর তার উস্তায মাওলানা আব্দুল মান্নান উযীরাবাদী ছিলেন আহলে হাদীস। শিক্ষকের নিকটে কুরআন-সুন্নাহর সঠিক জ্ঞান লাভ করার পর তিনি স্বীয় মাযহাব ত্যাগ করে আহলে হাদীস মাসলাকে দীক্ষিত হন।

জন্ম : মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল সালাফী (রাহিমাহুল্লাহ) ১৩১৪ হিজরী মুতাবেক ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে উযীরাবাদ[৭৮] জেলার গুজরানওয়ালায় জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা গ্রহণ : সালাফী (রাহিমাহুল্লাহ) বাল্যজীবনে তার পিতার নিকট থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। সেইসাথে মাওলানা 'উমার উদ্দীন উযীরাবাদীর নিকটে নাহু, সরফ, গুলিস্তা বুস্তা প্রভৃতি কিতাবে জ্ঞান লাভ করেন।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি তার পিতার উস্তায মাওলানা আব্দুল মান্নান উযীরাবাদীর নিকট গমন করে দ্বীনি শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় সফলতার সাথে বিচরণ করেন।

দিল্লী গমন : তৎকালীন ভারতবর্ষের ইসলামী শিক্ষাগার ও 'ইলমের লালনকেন্দ্র হিসাবে দিল্লির বেশ সুনাম-সুখ্যাতি ছিল। ভারত বিখ্যাত উলামায়ি কিরামের পদচারণায় মুখরিত ছিল দিল্লী। তিনি মাওলানা আব্দুল মান্নান উযীরাবাদীর নিকট শিক্ষা লাভ করে মাত্র ১২/১৩ বছর বয়সে ১৯০৮ সালে দিল্লী গমন করেন। শাইখুল আরব ওয়াল আজম মুহাদ্দিস আল্লামা নাযীর হুসাইন দেহলভী (রাহিমাহুল্লাহ) (১২২০ হি./১৮০২ খ্রি.-১৩২০ হি./১৯০২ খ্রি.) যে মাদ্‌রাসায় দার্‌স প্রদান করতেন সেখানে এসে তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ আব্দুল জব্বার উমরপুরীসহ অন্যান্য বড় বড় 'আলিমের নিকট ইসলামের বিভিন্ন শাখায় বুৎপত্তি অর্জন করেন।

অমৃতসর সফর : বর্তমান ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত অমৃতসর তৎকালীন সময়ে বিখ্যাত আহলে হাদীস পরিবার "গজনবী পরিবারের" 'ইল্‌মী খিদমাত দ্বারা সিক্ত ছিল। যেখানে যুগশ্রেষ্ঠ মুনাজির, জমঈয়তে আহলে হাদীস হিন্দের প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা আবুল ওয়াফা সানাউল্লাহ

* *যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক- জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ।*

[৭৮] *পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের একটি উল্লেখযোগ্য জেলা। লাহোর থেকে ১০০ কি. মি. উত্তরে চেনাব নদীর তীরে অবস্থিত।*

অমৃতসরী (১২৮৫ হি.-১৩৬৭ হি.) জন্ম গ্রহণ করেন। সালাফী (রাহিমাহুল্লাহ-র) সেখানে এসে গজনবী পরিবারের শ্রেষ্ঠ দুই সন্তান মাওলানা আব্দুল গফুর গজনবী ও মাওলানা আ. রহীম গজনবীর নিকট 'ইল্‌ম অর্জন করেন। অতঃপর বিভিন্ন বিষয়ে যেমন- 'ইল্‌মে মানকে, 'ইল্‌মে কালাম, 'ইল্‌মে ফালসাফাহ, 'ইল্‌মে নাফস ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। মুফতী মুহাম্মাদ হাসানের নিকট। যিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা লাভের পর লাহোরে জামিয়া আশরাফিয়া প্রতিষ্ঠা করেন।

যাদের দ্বারা তিনি প্রভাবিত : মানুষ কারো না কারো প্রতি দুর্বল হয়। কারো না কারো দ্বারা সে প্রভাবিত হয়। সালাফী (রাহিমাহুল্লাহ-র)-এর ব্যতিক্রম নন। 'ইল্‌মী ময়দানে তিনি প্রভাবিত ছিলেন অমৃতসরের মুফতী মুহাম্মাদ হাসান-এর। অপরদিকে সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি প্রভাবিত ছিলেন আল্লামা সানাউল্লাহ অমৃতসরী দ্বারা। আবার রাজনৈতিকভাবে তিনি প্রভাবিত ছিলেন বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ, কংগ্রেস সভাপতি, স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মাওলানা আবুল কালাম আযাদের (১৩০৬ হি./১৮৮৮ খ্রি.-১৩৭৭ হি./১৯৫৮ খ্রি.) দ্বারা। এভাবেই রাজনীতি, জমঈয়তে আহলে হাদীস ও 'ইল্‌মী ময়দানে নিরবিচ্ছিন্নভাবে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হয়েছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমা'ঈল সালাফী (রাহিমাহুল্লাহ-র)। যার ফলে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে তার ভূমিকা ছিল অসামান্য।

শিয়ালকোট আগমন : অতীতকাল থেকেই শিয়ালকোট ছিল ইসলামী জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রস্থল। যেখানে মুসলিম জাহানের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক আল্লামা ড. মুহাম্মাদ ইকবাল (রাহিমাহুল্লাহ-র) (১৮৭৭ হি.-১৯৩৮ খ্রি.) জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। সালাফী (রাহিমাহুল্লাহ-র) শিয়ালকোটে এসে সেখানকার বিখ্যাত আহলে হাদীস 'আলিম মাওলানা ইব্‌রাহীম মীর শিয়ালকোটীর (১২৯১ হি./১৮৭১ খ্রি.-১৩৭৬ হি./১৯৫৬ খ্রি.) নিকট শিক্ষার্জন করেন। যেহেতু নিজের নামের সাথে ছাত্রের পিতার নামের মিল রয়েছে এজন্য মাওলানা ইব্‌রাহীম মীর শিয়ালকোটী সালাফী (রাহিমাহুল্লাহ-র)-কে খুব ভালোবাসতেন। এমনকি তার বিশাল লাইব্রেরীর বিভিন্ন অমূল্য কিতাবাদী তাকে দান করেছিলেন।

হাদীস বর্ণনায় ইজাযত লাভ : হাদীস বর্ণনার জন্য ইজাযত লাভ অন্যতম শর্ত। সালাফী (রাহিমাহুল্লাহ-র) দু'জন মহান ব্যক্তি থেকে সেই ইজাযত লাভ করেন। এক. মাওলানা আব্দুল মান্নান উযীরাবাদী যিনি উস্তাদে পাঞ্জাব উপাধীতে ভূষিত ছিলেন। দুই. মাক্কার বিখ্যাত সালাফী 'আলিম শায়খ আবূ বক্‌র খুকীর (রাহিমাহুল্লাহ-র)। এভাবে দেখা যায় সালাফী (রাহিমাহুল্লাহ-র) ও নাবী (ﷺ)-এর মাঝে নিরবিচ্ছিন্ন সনদে ২৪ জন রাবী রয়েছেন।

গুজরানওয়ালায় প্রত্যাবর্তন : সালাফী (রাহিমাহুল্লাহ-র) নিজ জন্মভূমি গুজরানওয়ালায় মাওলানা ইব্‌রাহীম মীর শিয়ালকোটীর সাথে ১৩৩৯ হিজরী মুতাবিক ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে প্রত্যাবর্তন করেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী কর্মচঞ্চল এই মহান মনীষী নিজ জন্মভূমিতে আগমন করলে সকলেই সাদরে বরণ করে নেন। মাওলানা ইব্‌রাহীম মীর শিয়ালকোটী বলেন, আমি এখানে বেশিদিন থাকব না আর আমি এখানকার স্থানীয়ও নই। সুতরাং তুমিই এর দেখাশোনা করো। সেই সময়ে গুজরানওয়ালায় হাতেগোনা কয়েকজন জমঈয়ত হিতৈষী ছিলেন। এরপর সালাফী (রাহিমাহুল্লাহ-র) গুজরানওয়ালাতেই নিজের কর্মক্ষেত্র স্থির করলেন। সেখানকার আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় মাসজিদে ইমাম ও খুতবার দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দী ব্যাপ্তি ছিল তার বর্ণাঢ্য কর্মজীবন।

এরই মধ্যে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভিসি, বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ফকীহ আল্লামা বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ-র) সালাফী (রাহিমাহুল্লাহ-র)-কে মাদীনায় যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করেন। তিনি গুজরানওয়ালাতেই প্রাধান্য দেন অবস্থান করাকে এবং তদস্থলে শায়খ হাফিয মুহাম্মাদ কান্দলভীকে প্রেরণ করেন।

গুজরানওয়ালার এই আহলে হাদীস মাসজিদেই তিনি নিজ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করেন মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া। যেটি পঞ্চাশ বছরেরও অধিক সময় ধরে পাঞ্জাবের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত শিক্ষার্থীদের পিপাসা নিবারণ করত। সালাফী (রাহিমাহুল্লাহ-র) এই মাদ্‌রাসায় শুধু পাঠদানেই ক্ষান্ত ছিলেন না; বরং বিভিন্ন স্থান থেকে যোগ্য শিক্ষকদেরকে নিয়োগ দিয়ে এই মাদ্‌রাসাকে একটি আদর্শ ও উল্লেখযোগ্য মাদ্‌রাসায় পরিণত করেছিলেন। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো– সালাফী (রাহিমাহুল্লাহ-র)'র ইন্তিকালের পর গুজরানওয়ালা জমঈয়তে আহলে হাদীস মাদ্‌রাসা রক্ষণাবেক্ষণে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ফলে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায় (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)।

ছাত্রবৃন্দ : মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া থেকে এমন সহস্রাধিক ছাত্র বের হয়েছেন যারা পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রান্তে তাওহীদ ও সুন্নাহর বাণী প্রচারে অমরত্ব লাভ করেছেন। তাদের উল্লেখযোগ্য হলো– ১. ইসলামী দর্শনের বিখ্যাত পণ্ডিত শায়খ মুহাম্মাদ হানীফ নদভী। ২. শায়খ তায়্যিব 'আব্দুল্লাহ নাসর। ৩. শায়খ হাফিয মুহাম্মাদ ইসমা'ঈল যাবীহ, যিনি

বক্তৃতা ও পাঠদানে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ৪. শায়খ মুঈনুদ্দীন লাক্ষ্মৌভী, যিনি 'ইল্‌মে সিয়াসাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ৫. শায়খ মুহাম্মাদ সুলাইমান কাইলানী, যিনি আরবী ও ফারসী ভাষার কিতাবাদী অনুবাদে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ৬. শায়খ খালেদ কারজাখী, যিনি "ইদারাতু ইহয়ায়ে সুন্নাহ" প্রতিষ্ঠা করেন।

এছাড়াও অসংখ্য ছাত্র রয়েছেন যারা সালাফী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর হাতে শিক্ষা গ্রহণ করে আজীবন তাওহীদ ও সুন্নাহর খিদমাত করে গেছেন।

দৈনন্দিনের রুটিন : সালাফী (রাহিমাহুল্লাহ) জীবনে এত বেশি কর্মতৎপর ছিলেন যে, তা আমাদের বুঝতে খুবই কষ্টকর হয়। কিভাবে তিনি এত কাজের আঞ্জাম দিয়েছেন? মাসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত ইমামতি, জুমু'আর খুতবাহ্ প্রদান, নিয়মিত দারসে কুরআন প্রদান, মাদ্‌রাসায় নিয়মিত দারস প্রদান, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত ফাতাওয়ার লিখিত জবাবসহ ক্ষুরধার লেখনী। জমঈয়তের তাবলীগী ও সাংগঠনিক সফর, স্বাধীনতা আন্দোলনে অনবদ্য অবদান, এই হলো তার জীবনের দৈনন্দিন রুটিন। কোথাও নেই একটু ফুরসত, সামান্য বিশ্রাম, বিরামহীন কর্মময় এই জীবনে তিনি জমঈয়তের যে খিদমাতে আঞ্জাম দিয়ে গেছেন তা কি আমরা স্মরণ করি? তাদের রেখে যাওয়া পবিত্র আমানত কি আমরা যথাযথভাবে রক্ষা করি না-কি আমাদের দ্বারা খিয়ানত হচ্ছে?

বক্তৃতার মাঠে : বক্তৃতার ময়দানেও সালাফী (রাহিমাহুল্লাহ) ছিলেন এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তার বক্তৃতা ছিল তথ্য ও যুক্তিনির্ভর, বাস্তবভিত্তিক, বাক্য চয়নে ফুটে উঠত তার সাহিত্যের লালিত্য, শব্দের উচ্চাঙ্গতা, যা তাকে দিয়েছিল আকর্ষণীয় এক অদৃশ্য শক্তি। বক্তব্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা, বিষয়বস্তুতে শ্রোতামণ্ডলীকে ডুবিয়ে ফেলা, আর মুষলধারে এত উচ্চসাহিত্যের শব্দের আগমন সত্যিই যেন কথামালার পূঁতির মতো। ১৯২১ সালের পর থেকে তিনি কখনো কোন বিষয়ে প্রস্তুতি নিয়ে বক্তব্য দেননি। পাঞ্জাবের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত সব শ্রেণির শ্রোতাই তার বক্তব্যে হত বিমুগ্ধ, বিমোহিত ছিল তার ভক্ত ও অনুরক্ত।

লিখনী : এত ব্যস্ততার মাঝেও সালাফী (রাহিমাহুল্লাহ) উম্মাহর জন্য রেখে গেছেন অমূল্য কিছু গ্রন্থ, যা তাকে দান করেছে অমরত্ব। তিনি আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত হওয়ার পরও লিখে গেছেন উর্দুতে। সেগুলোর বেশ কিছু প্রকাশিত, আর কিছু অপ্রকাশিত। তিনি লিখেছেন :

اسلامی حکومت کا مختصر خاکہ.

১. ইসলামী হুকুমতের সংক্ষিপ্ত রুপরেখা।

جماعت اسلامی کا نظریم حدیث.

২. জামা'আতে ইসলামীর দৃষ্টিতে হাদীস।

تحرکی أزادی فکر اور شاہ ولی اللہ.

৩. "স্বাধীনতা আন্দোলন : একটি চিন্তা ও শাহ ওয়ালীউল্লাহর সংস্কার কার্যক্রম।"

বইটি আরবী ভাষায় রূপান্তর করেছেন প্রখ্যাত আরবী সাহিত্যিক ড. মুকতাদা হাসান আল আযহারী। নাম দিয়েছেন :

حركة الانطلاق الفكري وجهود الشاه ولى الله في التجديد.

مسئلة حيات النبى ﷺ.

৪. এ গ্রন্থটিরও আরবী করেছেন ড. মুকতাদা হাসান আল আযহারী। আরবী নাম হলো :

رسالة في مسئلة حياة النبى ﷺ. مسئلة زيارت قبور.

৫. একই অনুবাদক বইটির অনুবাদ করেছেন مسئلة زيارت قبور فى ضؤ الكتاب والسنة এই নামে।

৬. লেখকের আরো কিছু বই সেগুলো আরবীতে অনুবাদ হয়েছে। যেমন-

السنة فى ضوء القرآن. مكانة السنة فى التشريع الاسلامى.

صفة صلاة النبى ﷺ. تخطيط وجيز للحكومة الاسلامية.

مذهب الإمام البخارى.

৭. বইটির আরবী অনুবাদ করেছেন সালাহ উদ্দিন মাকবুল আহমাদ। নাম দিয়েছেন :

«موقف الجماعة الامسلا مية من الحديث النبوى»

دراسة نقدية مسلك الاعتدال للشيخ المودودى.

সালাফী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর লিখিত কিতাবগুলো ভারতের বিখ্যাত সংস্থা "ইদারাতুল বুহুস আল ইসলামিয়্যাহ ওয়াদ দা'ওয়াহ ওয়াল ইফতা" প্রকাশ করেছে। সৌদী সরকারও তার বেশ কিছু কিতাব আরবীতে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেছে। এভাবে আরব দুনিয়াতেও সালাফী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর গ্রন্থাদি ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

জমঈয়তে আহলে হাদীস এবং সালাফী (রাহিমাহুল্লাহ) : জমঈয়তে আহলে হাদীস এবং মাওলানা সালাফী (রাহিমাহুল্লাহ) ছিলেন পরস্পর অবিচ্ছেদ্য অংশ, ছিলেন অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত। অর্ধশতাব্দীরও অধিক কাল ধরে নিরলস খিদমাতে আঞ্জাম

দিয়ে গেছেন উপমহাদেশের প্রাচীন এই সংগঠনের। গুজরানওয়ালায় অবস্থান শুরু করলে ১৯৩১ সালে তিনি পাঞ্জাব জমঈয়তের স্থানীয় অফিসের পরিচালক পদে নির্বাচিত হন। এরপর ১৯৪০ সালে দিল্লী মহাসম্মেলনে জমঈয়তের শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সেক্রেটারী নির্বাচিত হন।

১৯৪৭ সালে হিন্দুস্তান থেকে পাকিস্তান পৃথক হলে নতুন করে ১৯৫২ সালে পাকিস্তান জমঈয়তে আহলে হাদীস পুনর্গঠিত হয়। নির্বাচনে শায়খ সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ দাঊদ গজনবী (রাহিমাহুল্লাহ) সভাপতি হিসাবে মনোনীত হন। আর মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল সালাফী (রাহিমাহুল্লাহ) সেক্রেটারী জেনারেল হিসাবে নির্বাচিত হন।

আমৃত্যু তিনি এই পদে বহাল থেকে জমঈয়তের উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাধনে অংশীদার হয়েছেন। তার এই পদের মেয়াদ ছিল (১৯৫২-১৯৬৮) ১৬ বছর।

ষাটের দশকে কাদিয়ানী ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে সারা ভারত-পাকিস্তানে ঐতিহাসিক খতমে নবুওয়াত আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। ১৯৫৩ সালে পাকিস্তানে খতমে নাবুওয়াত আন্দোলনের মহাসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলন বাস্তবায়ন কমিটিতে জমঈয়তে আহলে হাদীসের পক্ষ থেকে তিনজন মনোনীত হন। তাদের মাঝে শায়খ ইসমাঈল সালাফী (রাহিমাহুল্লাহ) অন্যতম। এই আন্দোলনে সালাফী (রাহিমাহুল্লাহ)-কে কারাবরণও করতে হয়েছিল।[৭৯]

১৯২৪ সালে ভারতে (বিশেষ করে মধ্য ভারতে) যখন জোর করে মুসলমানদের হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করার অপপ্রয়াস চলছিল যা "শিদহী আন্দোলন" নামে পরিচিত, তখন মধ্য প্রদেশে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে মুসলিম নেতারা একত্রিত হয়েছিলেন। পাঞ্জাব প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে সালাফী (রাহিমাহুল্লাহ) ছিলেন একজন উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধি।

মুহাজিরদের খিদমতে সালাফী (রাহিমাহুল্লাহ) : দেশ ভাগের পর ভারতে বসবাসরত অনেক মুসলিম হিজরত করে পাকিস্তানে পাড়ি জমালেন। শরয়ী দৃষ্টিকোণে তারা মুহাজির হিসাবে গণ্য হলেন। নতুন দেশ পাকিস্তানে তাদের থাকা, খাওয়া, চিকিৎসা, শিক্ষাসহ মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে এগিয়ে এলো পাকিস্তান জমঈয়তে আহলে হাদীস। গুজরানওয়ালার হিজরতকারী মুসলিমদের দেখাশুনার জন্য জমঈয়তের পক্ষ থেকে দায়িত্ব পেলেন মাওলানা ইসমাঈল সালাফী (রাহিমাহুল্লাহ)। দিনরাত বিশ্রামহীন পরিশ্রম করে সেবা করলেন তার মতো বিখ্যাত একজন 'আলিম। স্মরণীয় হয়ে থাকলেন ইতিহাসের পাতায়। গর্বিত অংশীদার হলেন মুহাজিরদের সেবাদানে।

জামিয়া সালাফিয়া ফয়সালাবাদ প্রতিষ্ঠা : সালাফী (রাহিমাহুল্লাহ) দিবানিশি স্বপ্ন দেখছিলেন একটি জামিয়া প্রতিষ্ঠার। যেখানে আহলে হাদীস মাসলাক ও সালাফদের মানহাজ পাবে প্রাধান্য। কুরআন-সুন্নাহর দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা উচ্চারিত হবে সেই দ্বীনি মারকায থেকে। এজন্য তার পছন্দ ছিল স্বাধীন কাশ্মীর অথবা পাকিস্তানের অন্য কোনো শহর। আল্লাহ তা'আলা সেই স্বপ্ন পূরণ করলেন। ৭ শাবান, ১৩৭৪ মুতাবিক এপ্রিল ১৯৫১। তিনি লায়েলপুরে[৮০] প্রতিষ্ঠা করলেন জামে'য়া সালাফিয়া। শুরু হলো পথচলা। অবিরাম, অবিচল, তাওহীদের দৃপ্ত শপথ নিয়ে। জামিয়া সালাফিয়ার লেখাপড়ার মান বৃদ্ধির জন্য তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি শায়খ বিন বাযের সাথে পত্রালাপে যোগাযোগ করলেন। মদীনার শিক্ষকদেরকে আমন্ত্রণ করলেন জামি'য়ার দার্‌স প্রদানের জন্য। যোগাযোগ ফলপ্রসু হয়েছিল। বেশ কয়েকজন সৌদী শায়খ জামিয়া সালাফিয়ায় এসে শিক্ষকতাও করেছিলেন।

ইহধাম ত্যাগ : মানুষ মরণশীল। বিশ্ববিশ্রুত নিষ্ঠুর এই অলঙ্ঘনীয় নীতিবাক্য মানতে বাধ্য হলেন মাওলানা ইসমাঈল সালাফী (রাহিমাহুল্লাহ)।

কয়েক বছর যাবৎ হাড়ের রোগে অসুস্থ থাকার পর ১৩৮৭ হিজরীর ২রা যিলকদ মুতাবেক ১৯৬৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার বাদ 'আসর ক্ষণজন্মা এই মহাপুরুষ, বিজ্ঞ আহলে হাদীস পণ্ডিত ইহকাল ত্যাগ করে মহান প্রভুর সান্নিধ্যে পরপারে পাড়ি জমান (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিঊন)।

প্রতিটি আহলে হাদীস সন্তান, তার অপূর্ব ত্যাগ ও কুরবানীর কথা পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করুক এই প্রত্যাশাই করি।

اللّٰهُمَّ اجعل الجنة منواه، ونور قبره، وافسح مقعده، واجعل بركة حياته جارية لنا، آمين يارب العالمين.

[৭৯] *সূত্র : ১৯৪৯ সালের ১৯ আগষ্টে প্রথম প্রকাশিত পাকিস্তান জমঈয়তের সাপ্তাহিক মূলপত্র "আল ই'তিসাম"। মার্চ, ১৯৬৮ সংখ্যা।*

[৮০] *পাকিস্তানের তৃতীয় বৃহত্তম শহর ফয়সালাবাদের পূর্ব নাম। ১৯৭৯ সালে সৌদী বাদশাহ শাহ ফয়সালের ফয়সালাবাদ নামকরণ করা হয়।*

সেদিন আবরাহার বাহিনী'র সঙ্গে কি ঘটেছিল!

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক*

ঘটনার সময়কাল : অধিকাংশ ঐতিহাসিকের অভিমত হচ্ছে, উক্ত ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্মগ্রহণের মাত্র ৫০ কিংবা ৫৫ দিন পূর্বে মুহাররম মাসে। এই প্রেক্ষিতে এটা ধরে নেয়া যায় যে, ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল ৫৭১ ঈসায়ী সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ ভাগে কিংবা মার্চ মাসের প্রথম ভাগে।[৮১]

মূল ঘটনা : হুমায়ের গোত্রের শেষ বাদশাহ যূনুয়াস, যে ছিল মুশরিক, তার সময়ের মুসলমানদেরকে পরিখার মধ্যে নিক্ষেপ করে হত্যা করেছিল। ঐ সব মুসলমান ছিল 'ঈসা এর সত্যিকার অনুসারী। তাঁদের সংখ্যা ছিল প্রায় তিন হাজার। তাঁদের সবাইকে শহীদ করে দেয়া হয়েছিল। দাঊস যু সা'লাবান নামক একটি মাত্র লোক বেঁচেছিলেন। তিনি সিরিয়ায় পৌঁছে রোমের বাদশাহ কায়সারের কাছে ফরিয়াদ করলেন। কায়সার ছিলেন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। তিনি হাবশার (আবিসিনিয়ার) বাদশাহ নাজাশীকে লিখলেন, 'দাঊস যু সা'লাবানের সঙ্গে পুরো বাহিনী পাঠিয়ে দিন'। সেখান থেকে শত্রুদেশ নিকটবর্তী ছিল। বাদশাহ নাজাশী আমীর ইবনু ইরবাত ও আবরাহা ইবনু সাহাব আবূ ইয়াকসুমকে সৈন্য পরিচালনার যৌথ দায়িত্ব দিয়ে এক বিরাট সেনাবাহিনী যূনুয়াসের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই সৈন্যদল ইয়ামেনে পৌঁছল এবং ইয়ামেন ও তথাকার অধিবাসীদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করল। যূনুয়াস পালিয়ে গেল এবং সমুদ্রে ডুবে মৃত্যুবরণ করল। যূনুয়াসের শাসন ক্ষমতা হারিয়ে যাওয়ার পর সমগ্র ইয়ামেন হাবশার বাদশাহর কর্তৃত্বে চলে গেল। সৈন্যাধ্যক্ষ হিসাবে আগমনকারী উভয় সর্দার ইয়ামেনে বসবাস করতে লাগলো। কিন্তু অল্প কিছুদিন পরই তাদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দিলো। শেষ পর্যন্ত উভয়ে নিজ নিজ বিভক্ত সৈন্যদলসহ মুখোমুখী সংঘর্ষের জন্যে প্রস্তুত হলো। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বক্ষণে উভয় সর্দার পরস্পরকে বলল, অযথা রক্তপাত করে কি লাভ, চলো আমরা উভয়ে লড়াই করি। যে বেঁচে যাবে, ইয়ামেন এবং সেনাবাহিনী তার অনুগত থাকবে। এই কথা অনুযায়ী উভয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হলো। আমীর ইবনু ইরবাত আবরাহার উপর আক্রমণ করল এবং তরবারীর এক আঘাতে তার চেহারা রক্তাক্ত করে ফেলল। নাক, ঠোঁট এবং চেহারার বেশ কিছু অংশ কেটে গেল। এই অবস্থা দেখে আবরাহার ক্রীতদাস আতূদাহ এক অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে ইরবাতকে হত্যা করে ফেলল। মারাত্মকভাবে আহত আবরাহা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে গেল। বেশ কিছু দিন চিকিৎসার পর তার ক্ষত ভাল হলো এবং সে ইয়ামেনের শাসনকর্তা হয়ে বসল। আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশী এ খবর পেয়ে খুবই ক্রুদ্ধ হলেন এবং এক পত্রে জানালেন, 'আল্লাহর কসম! আমি তোমার শহরসমূহ ধ্বংস করব এবং তোমার টিকি কেটে আনব'। আবরাহা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এ পত্রের জবাব লিখল এবং দূতকে নানা প্রকারের উপঢৌকন, একটা থলের মধ্যে ইয়ামেনের মাটি এবং নিজের মাথার কিছু চুল কেটে ওর মধ্যে রাখল ও ওর মুখ বন্ধ করে দিলো। তাছাড়া চিঠিতে সে নিজের অপরাধের ক্ষমা চেয়ে লিখল, 'ইয়ামেনে মাটি এবং আমার মাথার চুল হাযির রয়েছে, আপনি নিজের কসম পূর্ণ করুন এবং আমার অপরাধ ক্ষমা করে দিন!' এতে নাজাশী খুশী হলেন এবং ইয়ামেনের শাসনভার আবরাহাকে লিখে দিলেন। তারপর আবরাহা নাজাশীকে লিখল, 'আমি ইয়ামেনে আপনার জন্যে এমন একটি গীর্জা তৈরী করছি যে, এ রকম গীর্জা ইতিপূর্বে পৃথিবীতে কখনো তৈরী হয়নি'। অতি যত্নসহকারে খুবই মযবুত ও অতি উঁচু করে ঐ গীর্জাটি নির্মিত হলো। ঐ গীর্জার চূড়া এত উঁচু ছিল যে, চূড়ার প্রতি টুপি মাথায় দিয়ে তাকালে মাথার টুপি পড়ে যেত। আরববাসীরা ঐ গীর্জার নাম দিয়েছিল 'কালীস' অর্থাৎ- টুপি ফেলে দেয়া গীর্জা। এবার আবরাহা মনে করল যে, জনসাধারণ কা'বায় হাজ্জ না করে বরং এ গীর্জায় এসে হাজ্জ করবে। সারাদেশে সে এটা ঘোষণা করে দিলো। আদনানিয়্যাহ ও কাহতানিয়্যাহ গোত্র এ ঘোষণায় খুবই অসন্তুষ্ট, আর কুরাইশরা ভীষণ রাগান্বিত হলো। অল্প কয়েকদিন পরে দেখা গেল যে, এক ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে ঐ গীর্জায় প্রবেশ করে পায়খানা করে এসেছে। প্রহরীরা পরের দিন এ অবস্থা দেখে বাদশাহর কাছে খবর পাঠাল এবং অভিমত ব্যক্ত করল যে, কুরাইশরাই এ কাজ করেছে। তাদের মর্যাদা ক্ষুন্ন করা হয়েছে বলেই এ কাজ

* *প্রভাষক- সিটি মডেল কলেজ, জুরাইন, ঢাকা।*

[৮১] *আর রাহীকুল মাখতুম।*

তারা করেছে। আবরাহা তৎক্ষণাৎ কসম করে বলল, 'আমি মক্কার বিরুদ্ধে অভিযান চালাব এবং বায়তুল্লাহর প্রতিটি ইট পর্যন্ত খুলে ফেলব'।

অন্য এক বর্ণনায় এরূপও আছে যে, কয়েকজন উদ্যোগী কুরইশ যুবক ঐ গীর্জায় আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। সেই দিন বাতাস প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হয়েছিল বলে আগুন ভালভাবে ঐ গীর্জাকে গ্রাস করেছিল এবং ওটা মাটিতে ধ্বসে পড়েছিল। অতঃপর ক্রুদ্ধ আবরাহা এক বিরাট বাহিনী নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলো। তাদের সাথে এক বিরাট উঁচু ও মোটা হাতী ছিল। ঐরূপ হাতী ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায়নি। হাতীটির নাম ছিল মাহমূদ। বাদশাহ নাজাশী মক্কা অভিযান সফল করার লক্ষ্যে ঐ হাতীটি আবরাহাকে দিয়েছিল। ঐ হাতীর সাথে আবরাহা আরো আটটি অথবা বারোটি হাতী নিলো। তার উদ্দেশ্য ছিল যে, সে বায়তুল্লাহর দেয়ালে শিকল বেঁধে দিবে, তারপর সমস্ত হাতীর গলায় ঐ শিকল লাগিয়ে দিবে। এতে শিকল টেনে হাতীগুলো সমস্ত দেয়াল একত্রে ধ্বসিয়ে দিবে। মক্কার অধিবাসীরা এ সংবাদ পেয়ে দিশাহারা হয়ে পড়ল। যে কোন অবস্থায় এর মুকাবিলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। যুনফর নামক ইয়ামেনের একজন রাজ বংশীয় লোক নিজের গোত্র ও আশে পাশের বহু সংখ্যক আরবকে একত্রিত করে দুর্বৃত্ত আবরাহার মুকাবিলা করলেন। কিন্তু মহাপরাক্রমশালী মহান আল্লাহর ইচ্ছা ছিল অন্যরকম। যুনফর পরাজিত হলেন এবং আবরাহার হাতে বন্দী হলেন। যুনফরকেও সঙ্গে নিয়ে আবরাহা মক্কার পথে অগ্রসর হলো। খাশআম গোত্রের এলাকায় পৌঁছার পর নুফায়েল ইবন হাবীব খাশআমী একদল সৈন্য নিয়ে আবরাহার মুকাবিলা করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁরাও আবরাহার হাতে পরাজয় বরণ করলেন। নুফায়েলকেও যুনফরের মতো বন্দী করা হলো। আবরাহা প্রথম নুফায়েলকে হত্যা করার ইচ্ছা করল, কিন্তু পরে মক্কার পথ দেখিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে জীবিতাবস্থায় সঙ্গে নিয়ে চলল। তায়েফের উপকণ্ঠে পৌঁছলে ছাক্বীফ গোত্র আবরাহার সাথে সন্ধি করল যে, লাত মূর্তিটি যে প্রকোষ্ঠে রয়েছে, আবরাহার সৈন্যরা ঐ প্রকোষ্ঠের কোনো ক্ষতি সাধন করবে না। সাক্বীফ গোত্র আব রিগাল নামক একজন লোককে পথ দেখিয়ে দেয়ার জন্যে আবরাহার সঙ্গে দিলো। মক্কার কাছে মুগমাস নামক স্থানে তারা অবস্থান করল। আবরাহার সৈন্যরা আশেপাশের জনপদ এবং চারণভূমি থেকে বহু সংখ্যক উট এবং অন্যান্য পশু দখল করে নিলো। এগুলোর মধ্যে আব্দুল মুত্তালিবের দু'শ উটও ছিল। এতে আরবের কবিরা আবরাহার নিন্দা করে কবিতা রচনা করল সীরাতে ইবনু ইসহাকে ঐ কবিতার উল্লেখ রয়েছে। অতঃপর আবরাহা নিজের বিশেষ দূত হানাতাহ হুমাইরীকে বলল, তুমি মক্কার সর্বাপেক্ষা বড় সর্দারকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এস এবং ঘোষণা করে দাও, আমরা মক্কাবাসীদের সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি, তার ঘর ভেঙ্গে ফেলাই শুধু আমাদের উদ্দেশ্য। তবে হ্যাঁ, মক্কাবাসীরা যদি কা'বাগৃহ রক্ষার জন্যে এগিয়ে আসে এবং আমাদেরকে বাধা দেয় তাহলে বাধ্য হয়ে আমাদেরকে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে। হানাতাহ মক্কার জনগণের সাথে আলোচনা করে বুঝতে পারল যে, আব্দুল মুত্তালিব ইবনু হাশেমই মক্কার বড় নেতা। হানাতাহ 'আব্দুল মুত্তালিবের সামনে আবরাহার বক্তব্য পেশ করলে আব্দুল মুত্তালিব বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমাদের যুদ্ধ করার ইচ্ছাও নেই এবং যুদ্ধ করার মতো শক্তিও নেই'। মহান আল্লাহর সম্মানিত ঘর। তার প্রিয় বন্ধু ইব্রাহীম-এর জীবন্ত স্মৃতি।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে নিজের ঘরের হিফাযত নিজেই করবেন। অন্যথা তাঁর ঘরকে রক্ষা করার সাহসও আমাদের নেই এবং যুদ্ধ করার মতো শক্তিও আমাদের নেই'। হানাতাহ তখন তাঁকে বলল, 'ঠিক আছে, আপনি আমাদের বাদশাহর কাছে চলুন'। আব্দুল মুত্তালিব তখন তার সাথে আবরাহার কাছে গেলেন। 'আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন, বলিষ্ঠ দেহ সৌষ্ঠবের অধিকারী। তাঁকে দেখা মাত্র যে কোন মানুষের মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক হত। আবরাহা তাঁকে দেখেই সিংহাসন থেকে নেমে এলো এবং তাঁর সাথে মেঝেতে উপবেশন করল, সে তার দোভাষীকে বলল, তাকে জিজ্ঞেস করো, তিনি কি চান? আব্দুল মুত্তালিব জানালেন, 'বাদশাহ আমার দু'শ উট লুট করিয়েছেন। আমি সেই উট ফেরত নিতে এসেছি'। বাদশাহ আবরাহা তখন দো-ভাষীর মাধ্যমে তাঁকে বলল, প্রথম দৃষ্টিতে আপনি যে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন, আপনার কথা শুনে সে শ্রদ্ধা লোপ পেয়ে গেছে। নিজের দু'শ উটের জন্যে আপনার এত চিন্তা অথচ স্বজাতির ধর্মের জন্যে কোন চিন্তা নেই! আমি আপনাদের 'ইবাদতখানা কা'বা ধ্বংস

করে ধূলিস্যাৎ করতে এসেছি'। একথা শুনে আব্দুল মুত্তালিব জবাবে বললেন, 'শুন, উটের মালিক আমি, তাই উট ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করতে এসেছি। আর কা'বা গৃহের মালিক হলেন স্বয়ং আল্লাহ। সুতরাং তিনি নিজেই নিজের ঘর রক্ষা করবেন'। তখন ঐ নরাধম বলল, 'আজ স্বয়ং মহান আল্লাহও কা'বাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবেন না'। একথা শুনে আব্দুল মুত্তালিব বললেন, 'তা আল্লাহ তা'আলা জানেন এবং আপনি জানেন'। এও বর্ণিত আছে যে, মক্কার জনগণ তাদের ধন-সম্পদের এক তৃতীয়াংশ আবরাহাকে দিতে চেয়েছিল, যাতে সে এই ঘৃণ্য অপচেষ্টা হতে বিরত থাকে। কিন্তু আবরাহা তাতেও রাজী হয়নি।

মোটকথা আব্দুল মুত্তালিব তাঁর উটগুলো নিয়ে ফিরে আসলেন এবং মক্কাবাসীদেরকে বললেন, 'তোমরা মক্কাকে সম্পূর্ণ খালি করে দাও। সবাই তোমরা পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নাও'। তারপর আব্দুল মুত্তালিব কুরাইশের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে কা'বা গৃহে গিয়ে কা'বার খুঁটি ধরে দেয়াল ছুয়ে মহান আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করলেন এবং কায়মনোবাক্যে ঐ পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ গৃহ রক্ষার জন্যে প্রার্থনা করলেন। আবরাহা এবং তার রক্ত পিপাসু সৈন্যদের অপবিত্র ইচ্ছার কবল থেকে কা'বাকে পবিত্র রাখার জন্যে আব্দুল মুত্তালিব কবিতার ভাষায় নিম্নলিখিত দু'আ করেছিলেন, দু'আটির মর্মার্থ হলো– 'আমরা নিশ্চিন্ত, কারণ আমরা জানি যে, প্রত্যেক গৃহমালিক নিজেই নিজের গৃহের হিফাযত করেন। হে আল্লাহ! আপনিও আপনার গৃহ আপনার শত্রুদের কবল হতে রক্ষা করুন। আপনার অস্ত্রের উপর তাদের অস্ত্র জয়যুক্ত হবে এমন যেন কিছুতেই না হয়'। অতঃপর আব্দুল মুত্তালিব কা'বা গৃহের খুঁটি ছেড়ে দিয়ে তাঁর সঙ্গীদেরকে নিয়ে ওর আশে পাশের পর্বতসমূহের চূড়ায় উঠে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এমনও বর্ণিত আছে যে, কুরবানীর একশত পশুকে নিশান লাগিয়ে কা'বার আশে পাশে ছেড়ে দিলেন। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যদি দুর্বৃত্তরা মহান আল্লাহর নামে ছেড়ে দেয়া পশুর প্রতি হাত বাড়ায় তাহলে মহান আল্লাহর গযব তাদের উপর অবশ্যই নেমে আসবে। পরদিন প্রভাতে আবরাহার সেনাবাহিনী মক্কায় প্রবেশের উদ্যোগ গ্রহণ করল। বিশেষ হাতী মাহমূদকে সজ্জিত করা হলো। পথে বন্দী হয়ে আবরাহার সাথে আগমনকারী নুফায়েল ইবনু হাবীব তখন মাহমূদ নামক হাতীটির কান ধরে বললেন, 'মাহমূদ! তুমি বসে পড়ো, আর যেখান থেকে এসেছ সেখানে ভালভাবে ফিরে যাও। তুমি মহান আল্লাহর পবিত্র শহরে রয়েছ'। একথা বলে নুফায়েল হাতির কান ছেড়ে দিলেন এবং ছুটে গিয়ে নিকট এক পাহাড়ের আড়ালে গিয়ে আত্মগোপন করলেন। মাহমূদ নামক হাতীটি নুফায়েলের কথা শুনার সাথে সাথে বসে পড়ল। বহুচেষ্টা করেও তাকে নড়ানো সম্ভব হলো না। পরীক্ষামূলকভাবে ইয়ামেনের দিকে তার মুখ ফিরিয়ে টেনে তোলার চেষ্টা করতেই হাতী তাড়াতাড়ি উঠে দ্রুত অগ্রসর হতে লাগল। পূর্বদিকে চালাবার চেষ্টা করা হলে সেদিকেও যাচ্ছিল, কিন্তু মক্কা শরীফের দিকে মুখ ঘুরিয়ে চালাবার চেষ্টা করতেই বসে পড়ল। সৈন্যরা তখন হাতীটিকে প্রহার করতে শুরু করল। এমন সময় দেখা গেল এক ঝাঁক পাখি কালো মেঘের মতো হয়ে সমুদ্রের দিক থেকে উড়ে আসছে।[৮২] 'উবায়েদ ইবনু 'উমায়ের বলেন, 'সেগুলো ছিল সামুদ্রিক কালো পাখি, যার ঠোঁটে ও পায়ে কংকর ছিল'। ইবনু মাস'ঊদ, ইবনু যায়েদ ও আখফাশ বলেন, 'চারিদিক থেকে তারা এসেছিল'[৮৩]। ইকরামা বলেন, 'সবুজ পাখি যা সমুদ্রের দিক থেকে এসেছিল'। ওয়াক্বেদী তার সূত্রে উল্লেখ করেন যে, পাখিগুলো ছিল হলুদ যা কবুতরের চেয়ে ছোট এবং পাগুলো ছিল লাল রংয়ের। প্রত্যেকের সাথে ছিল তিনটি করে কংকর। সেগুলো তারা নিক্ষেপ করে। অতঃপর তারা সব ধ্বংস হয়ে যায়'[৮৪]। সা'ঈদ ইবনু জুবায়ের বলেন, সবুজ পাখি। যার ঠোঁট ছিল হলুদ। তিনি বলেন, 'এগুলো ছিল আসমানী পাখি। যার ন্যায় পাখি তার পূর্বে বা পরে আর কখনো দেখা যায়নি'[৮৫]।

অনেকে 'আবাবীল'-কে এক প্রকার পাখি ধারণা করেন। এমনকি এ পাখির অদ্ভূত সব কাল্পনিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন। যেমন- 'এরা সারাদিন উড়ে বেড়ায়। কোথাও বসে না। এদের মারলে মহান আল্লাহর গযবে মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে। সাতটা মানুষ খুন করতে রাযী, কিন্তু এদের বাসা ভাঙতে রাযী নই' ইত্যাদি। বিশেষ করে কারাগারগুলোতে এক ধরনের কালো পাখি দেখা যায়। সেগুলোকে কারাগারের লোকেরা 'আবাবীল' পাখি বলে এবং 'বরকতের পাখি' মনে করে। অথচ এগুলো স্রেফ ধারণা মাত্র।[৮৬]

---

[৮২] *তাওযীহুল কুরআন।*
[৮৩] *কুরতুবী, ইবনু কাসীর।*
[৮৪] *ইবনু কাসীর।*
[৮৫] *কুরতুবী।*
[৮৬] *তাফসীরুল কুরআন।*

চোখের পলকে ওগুলো আবরাহার সেনাবাহিনীর মাথার উপর এসে পড়ল এবং চতুর্দিক থেকে তাদেরকে ঘিরে ফেলল। প্রত্যেক পাখির চঞ্চুতে একটি এবং দু'পায়ে দু'টি কংকর ছিল। কংকরের ঐ টুকরাগুলো ছিল মসুরের ডাল বা মাস কলাইর সমান। পাখিগুলো কংকরের ঐ টুকরাগুলো আবরাহার সৈন্যদের প্রতি নিক্ষেপ করছিল। যার গায়ে ঐ কংকর পড়ছিল সেই সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ভবলীলা সাঙ্গ করছিল।

সৈন্যরা এদিক ওদিক ছুটাছুটি করছিল আর নুফায়েল নুফায়েল বলে চীৎকার করছিল। কারণ তারা তাঁকেই পথ প্রদর্শক হিসাবে সঙ্গে এনেছিল। নুফায়েল তখন পাহাড়ের শিখরে আরোহণ করে অন্যান্য কুরাইশদের সাথে আবরাহা ও তার সৈন্যদের দুরাবস্থার দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। ঐ সময় নুফায়েল নিম্নলিখিত কবিতাংশ পাঠ করছিলেন–

'এখন আর আশ্রয়স্থল কোথায়?
স্বয়ং মহান আল্লাহই তো ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।
শুনো, দুর্বৃত্ত আশরম পরাজিত হয়েছে,
জয়ী হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়'।

এ ঘটনার প্রেক্ষিতে নুফায়েল আরো বলেন : "'হাতীওয়ালাদের দুরাবস্থার সময়ে তুমি যদি উপস্থিত থাকতে! মুহাসসাব প্রান্তরে তাদের উপর 'আযাবের কংকর বর্ষিত হয়েছে। তুমি সে অবস্থা দেখলে মহান আল্লাহর দরবারে সাজদায় পতিত হতে। আমরা পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে মহান আল্লাহর প্রশংসা করছিলাম। আমাদের হৃৎপিণ্ড কাঁপছিল এই ভয়ে যে, না জানি হয় তো আমাদের উপরও এই কংকর পড়ে যায় এবং আমাদেরও দফারফা করে দেয়। পুরো সম্প্রদায় মুখ ফিরিয়ে পালাচ্ছিল ও নুফায়েল নুফায়েল বলে চীৎকার করছিল, যেন নুফায়েলের উপর হাবশীদের ঋণ রয়েছে'।

ওয়াকেদী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন যে, পাখিগুলো ছিল সবুজ রঙের। ওগুলো কবুতরের চেয়ে কিছু ছোট ছিল। ওদের পায়ের রঙ ছিল লাল। অন্য এক রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, মাহমূদ নামক হাতীটি যখন বসে পড়ল এবং সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও তাকে উঠানো সম্ভব হলো না, তখন সৈন্যরা অন্য একটি হাতীকে সামনের দিকে নেয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু সে পা বাড়াতেই তার মাথায় কংকরের টুকরো পড়ল এবং আর্তনাদ করে পিছনে সরে এলো। অন্যান্য হাতীও তখন এলোপাতাড়ি ছুটতে শুরু করল। কয়েকটির উপর কংকর পড়ায় তৎক্ষণাৎ ওগুলো মারা গেল। যারা ছুটে পালাচ্ছিল, তাদেরও এক একটি অঙ্গ খসে খসে পড়ছিল এবং অবশেষে সবগুলোই মারা গেল। আবরাহা বাদশাহও ছুটে পালাল, কিন্তু তারও এক একটি অঙ্গ খসে খসে পড়ছিল। সান'আ (তৎকালীন ইয়ামেনের রাজধানী) নামক শহরে পৌঁছার পর সে মাংসপিণ্ডে পরিণত হলো এবং কুকুরের মতো ছটফট করতে করতে প্রাণ ত্যাগ করল। তার কলিজা ফেটে গিয়েছিল। কুরাইশরা প্রচুর ধন-সম্পদ পেয়ে গিয়েছিল। আব্দুল মুত্তালিব তো সোনা সংগ্রহ করে করে একটি কূপ ভর্তি করেছিলেন। ঐ বছরই সারা দেশে প্রথম ওলা ওঠা এবং প্লেগ রোগ দেখা দেয়। হরযল, হানযাল প্রভৃতি কটুগাছও ঐ বছর উৎপন্ন হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর ভাষায় এ নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন এবং যেনো বলছেন, যদি তোমরা আমার ঘরের সম্মান এভাবে করতে থাকতে এবং আমার রাসূল-এর কথা মানতে, তবে আমিও সেভাবে তোমাদের হিফাযত করতাম এবং শত্রু দল থেকে তোমাদেরকে মুক্তি দিতাম।

ইবনু ইসহাক বলেন, আবরাহা বাহিনী মক্কা থেকে পালিয়ে ইয়ামেন পর্যন্ত পথে পথে মরতে মরতে যায় এবং আবরাহা তার প্রিয় রাজধানী সান'আ শহরে পৌঁছে লোকদের কাছে মহান আল্লাহর গযবের ঘটনা বলার পর মৃত্যুবরণ করে। এ সময় তার বুক ফেটে কলিজা বেরিয়ে যায়'। মুক্বাতিল ইবনু সুলায়মান বলেন, কুরায়েশরা ঐদিন বহুমূল্য গণীমতের মাল হস্তগত করে। একা আব্দুল মুত্তালিব যা স্বর্ণ পান, তাতে তাঁর সমস্ত পাত্র পূর্ণ হয়ে যায়। ইবনু ইসহাক বলেন, এর পরপরই আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ রহমতস্বরূপ কুরায়েশদের গৃহে তাঁর প্রিয়নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে প্রেরণ করেন[৮৭]। তিনি বলেন, আবরাহা বাহিনীর এই মর্মান্তিক পরিণতির ফলে সমগ্র আরবে কুরায়েশদের সম্মান ও মর্যাদা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। তারা তাদেরকে 'আল্লাহওয়ালা' বলতে থাকে। তারা বলতে থাকে যে, 'আল্লাহ তা'আলা তাদের পক্ষে লড়াই করেছেন এবং তাদেরকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন[৮৮]। এই ঘটনার পর দশ বছর মক্কার লোকেরা মূর্তিপূজা থেকে বিরত থাকে।[৮৯] ❑

[৮৭] *ইবনু কাসীর।*
[৮৮] *কুরতুবী।*
[৮৯] *হাকিম- ২/৫৩৬, হা. ৬৮৭৭; সহীহাহ্- হা. ১৯৪৪।*

বিশুদ্ধ 'আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস

নবী-তনয়া ফাতিমাহ্'র গৃহে জান্নাতের খাবার?

"রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।" *(সূরা আল হাশ্র : ৭)*

আরাফাত ডেস্ক : ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ছিলেন প্রিয় নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর প্রাণপ্রিয় তনয়া। মহানবী মুহাম্মদ (ﷺ) ফাতিমাহ্ ছাড়াও আরো তিন পুত্র ও তিন কন্যা সন্তানের জনক ছিলেন। তাঁরা সকলে মহানবী (ﷺ) জীবদ্দশাতেই মৃত্যুবরণ করেন। মুহাম্মদ (ﷺ)-এর মোট ৩ পুত্র ও ৪ কন্যার মধ্যে ইব্রাহীম ব্যতীত বাকি ৬ সন্তানের সবাই খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন।[৯০]

খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র গর্ভে রাসূল (ﷺ)-এর প্রথম সন্তান ক্বাসেম। তার নামেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপনাম ছিল আবুল ক্বাসেম। অতঃপর কন্যা যয়নব, পুত্র 'আব্দুল্লাহ; যার লকব ছিল ত্বাইয়িব ও ত্বাহের। কারণ তিনি নবুওয়াত লাভের পর 'আব্দুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর রুক্বাইয়া, উম্মে কুলসূম ও ফাতিমাহ্। ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ।

উল্লেখ্য যে, ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে নিয়ে ইতিহাস ও হাদীসে যত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (ﷺ)-এর অন্য কোনো সন্তান নিয়ে তা বর্ণিত হয়নি। এর কারণ হলো– **প্রথমতঃ** মহানবী (ﷺ)-এর অন্য সন্তানগণ তাঁর জীবদ্দশাতেই মৃত্যুবরণ করেছেন, একমাত্র ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর ওফাতের পরও ছয় মাস জীবিত ছিলেন। তাছাড়া ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে জান্নাতি নারীগণের নেত্রী হিসেবে মনোনীত করেছেন স্বয়ং মহানবী (ﷺ)। **দ্বিতীয়তঃ** ভ্রান্ত শিয়া সম্প্রদায় ও জাল হাদীস বর্ণনাকারী মিথ্যুক সম্প্রদায় নিজ স্বার্থ চরিতার্থের মানসে ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সম্পর্কে বহু জাল ও বানোয়াট কাহিনির অবতারণা করেছে। এরূপ একটি মিথ্যা কল্পকথা মহানবীর প্রাণপ্রিয় কন্যা ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র গৃহে জান্নাতের খাবার। ঘটনাটি নিম্নরূপ :

নবীকন্যা ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সম্পর্কে একটি কিসসা লোকমুখে প্রসিদ্ধ আছে। এছাড়াও সেদিন হকারদের মাধ্যমে সমাজে ছড়ানো 'ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর জীবনী' নামের একটি চটি বইয়েও কিসসাটি দেখতে পেলাম–

একদা মহানবী (ﷺ) একাধারে দুই দিন অনাহারে থাকার পর তৃতীয় দিন প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত অবস্থায় কন্যা ফাতিমার বাড়িতে গমন করলেন। মহানবীর মুখ দেখেই কন্যা ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বুঝলেন, পিতা অনেক ক্ষুধার্ত। কিন্তু তার কিছুই করার ছিল না। কারণ, নিজ পরিবারই তিন দিন থেকে উপবাসে দিনাতিপাত করছেন। এদিকে মহানবী (ﷺ)-ও প্রাণপ্রিয় আদরের কন্যার চেহারায় অনাহারের ছাপ দেখতে পেলেন। মনোকষ্টে স্বীয় কন্যাকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়ে গৃহ ত্যাগ করলেন।

অপরদিকে পিতাকে কিছু না খাওয়াতে পেরে ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-ও নিদারুণ মনোপীড়ায় ভুগতে লাগলেন। এরপর ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) দু'হাত তুলে মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন এবং কান্নাভেজা কণ্ঠে ফরিয়াদ জানালেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যে অবস্থায় রাখো আমি তাতেই খুশি; কিন্তু আমার পিতা আমার বাড়ি থেকে না খেয়ে যাবেন– এটা আমার জন্য বড়ো মনোকষ্টের কারণ। তিনি চোখের পানি ছেড়ে কাঁদতে থাকলেন। একপর্যায়ে হঠাৎ দেখতে পেলেন, এক অপরিচিত লোক এসে রুটি এবং পাকানো গোশ্ত রেখে চলে গেল। নবীকন্যা দু'আ শেষে এ খাদ্যসামগ্রী দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। পুত্র হাসানকে পাঠালেন, নানাকে ডেকে আনার জন্য। মহানবী (ﷺ) কন্যার গৃহে উপস্থিত হলে ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) পিতার সামনে অপরিচিত লোকের দেওয়া খাবার পেশ করলেন। খাদ্যসামগ্রী দেখে মহানবী জিজ্ঞেস করলেন, এ খাবার কোথা থেকে এলো। ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, যেখান থেকে 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর মাতা মারইয়াম (আলাইহাস সালাম)-এর খাবার আসত সেই জান্নাত থেকেই এ বরকতময় খাবার এসেছে। একথা শুনে মহানবী বেজায় খুশি হলেন।

সকলে মিলে সে খাবার খেয়ে পরিতৃপ্ত হলেন এবং দেখলেন যে, খাবার উদ্বৃত্ত রয়েছে। নবীকন্যা বেঁচে যাওয়া খাবার নিজের জন্য না রেখে সব প্রতিবেশীদের মাঝে বিলিয়ে দিলেন। তখন এ বরকতময় খাবার দ্বারা প্রতিবেশীরাও তৃপ্ত হলেন। সে খাবার খেয়ে প্রতিবেশীরা বলতে লাগল, এমন মজাদার খাবার আমরা আর কখনও খাইনি।

এটি সম্পূর্ণ বানোয়াট ও মিথ্যা ঘটনা; নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্রে তা পাওয়া যায় না। নবী পরিবারের সাথে এর চেয়েও অলৌকিক ব্যাপার ঘটতে পারে। কিন্তু যা ঘটেনি তা নবী পরিবারের সাথে যুক্ত করে বর্ণনা করা ঈমান বিধ্বংসী কবীরা গুনাহ। আর এর কোনো ফায়দাও নেই। সুতরাং আমরা তা বলা থেকে বিরত থাকব।

[৯০] *ইবনু হিশাম- ১/১৯০; সহীহ মুসলিম- হা. ২৪৩৬।*

ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর সাথে নবীজী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনাহার ও ক্ষুধাকষ্ট সংক্রান্ত কিছু ঘটনা নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া যায়, আমরা সেগুলো আলোচনা করতে পারি এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। যেমন- একদা ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এক টুকরো যবের রুটি নিয়ে এলেন। নবীজী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা খেয়ে বললেন–

هَذَا أَوَّلُ طَعَامٍ أَكَلَهُ أَبُوْكِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

তিন দিনের মধ্যে এই প্রথম তোমার পিতা খাবার খেল।

(আরেক বর্ণনায় রয়েছে) রুটি আনলে নবীজী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, এটা কী? ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, আমি রুটি প্রস্তুত করলাম, তখন আমার মন চাইল না- আপনাকে রেখে খাই; তাই আপনার জন্য একটু নিয়ে এলাম।[৯১]

'ইমরান ইবনু হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একবার আমি নবীজী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এলেন। নবীজী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন, কাছে এসো ফাতিমাহ্! ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) একটু কাছে এলেন। নবীজী আবার বললেন, আরো কাছে এসো। (অনাহারে) ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর চেহারা হলুদ বর্ণ ধারণ করেছিল। রক্তশূন্যতা দেখা দিয়েছিল। তখন নবীজী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর জন্য দু'আ করলেন এবং বললেন–

لَا تُجِعْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ.

"হে আল্লাহ!... মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাকে আপনি ক্ষুধার্ত রাখবেন না।" 'ইমরান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবীজীর দু'আর পর আমি দেখলাম, ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর চেহারার হলুদ বর্ণ চলে গেল এবং রক্তশূন্যতা কেটে গেল। পরবর্তীতে আমি ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন–

مَا جُعْتُ بَعْدَ ذٰلِكَ يَا عِمْرَانُ.

'ইমরান! নবীজীর ঐ দু'আর পর থেকে আমি আর কোনোদিন ক্ষুধায় কষ্ট পাইনি।[৯২]

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, মিথ্যা ফযীলত বা প্রশংসা দ্বারা করো সম্মান বৃদ্ধি করা যায় না। কোনো ব্যক্তির নামে মিথ্যা বর্ণনা বা অতি প্রশংসাসূচক কথা তাকে পরোক্ষভাবে অপমান অপদস্ত করার নামান্তর। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করুন –আমীন। *[গ্রন্থনা : আবু ফাইয়ায এম জি রহমান]* ❑

[৯১] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ১৩২২৩; আল মুজামুল কাবীর; তবারানী- হা. ৭৫০; মাজমাউয যাওয়ায়েদ- হা. ১৮২৩৩।*

[৯২] *আল মুজামুল আওসাত; তবারানী- হা. ৩৯৯৯; মাজমাউয যাওয়ায়েদ- হা. ১৫২০৫।*

প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান...

[৩৭ পৃষ্ঠার পর]

স্কুলগুলোতে অন্যতম সমস্যা হলো প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী প্রধান শিক্ষকের দ্বন্দ্ব। এটা সৃষ্টি হয় রাজনৈতিক ভিন্ন মতাদর্শের কারণে, সহকারী প্রধান শিক্ষক হয়তো প্রধান শিক্ষক হতে চেয়েছিলেন পারেননি। প্রধান শিক্ষক সহকারী প্রধান শিক্ষককে দায়িত্ব দেন না। অনেক সময় আর্থিক বিষয়ে স্বচ্ছতা ও সততা না দেখালেও এই ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হয়। এই দুই শিক্ষকের দ্বন্দ্বের কারণে সমগ্র স্কুলটির একতা ও সৌন্দর্য নষ্ট হয়। স্কুলকে এগিয়ে নেয়ার সম্মিলিত প্রয়াস থাকে না। পাঠদান ব্যাহত হয়। শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক হতাশ হয়ে পড়েন। এটা শুধু একটি দু'টি স্কুলের ঘটনা নয়। প্রায় সব স্কুলেই হয় প্রধান শিক্ষক নয়তো সহকারী প্রধান শিক্ষক স্কুলের জন্য মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা শিক্ষার্থীদের দ্বন্দ্ব নিরসন শেখাবেন, সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জনের পথ দেখাবেন, কীভাবে দলগত কাজ করতে হয়, কীভাবে টিমওয়ার্ক করতে হয় তা শেখাবেন তারাই বড় বড় সমস্যার পাহাড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো– আমরা প্রধন শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক-সহ অন্যদের মধ্যে কেমন সম্পর্ক চাই?

সহজ উত্তর, ইতিবাচক সম্পর্ক চাই। কেমন করে হবে? কারা এই সম্পর্ক তৈরি করবে? এটা শিক্ষকরা করবেন। ধীরে ধীরে স্কুলে এক অপরকে বুঝার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ একই কক্ষে বসবেন। না হলোও দিনে অন্তত একবার দশ মিনিটের জন্য মিটিং করবেন। সবার সমস্যা বুঝার চেষ্টা করবেন। সমস্যা জানার চেষ্টা করবেন। নিজেকে অন্যের জায়গায় বসিয়ে সমস্যা বুঝবেন। আলোচনা করবেন। স্কুলের কাজে সব শিক্ষকের মতামত নিবেন। আপনি এখন স্কুলে, রাজনৈতিক পরিচয় বাদ দিন। ভুলে যান আপনার ক্ষমতার দাপট। স্কুল কি আপনার পরিবার নয়? আপনি কি চান আপনার পরিবার ধ্বংশ হয়ে যাক? আপনার পরিবারে অশান্তি হোক? আপনার পরিবারের একতা নষ্ট হোক? না, আপনি তা কখনো চান না। তাই আপনি শিক্ষক এবং সমস্ত শিক্ষার্থীর অভিভাবক- এই পরিচয় লালন করুন। আপনারাই স্কুলের রোলমডেল। আপনাদের দেখেই শিক্ষার্থীরা শিখবে। আপনাদের তারা অনেক বড় মাপের মানুষ মনে করে। আপনাদের নিকট শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা আকাশের মতো বিশাল। এই প্রত্যাশা হতাশায় রূপান্তরিত হবে না আপনি চাইলে। ❑

সমাজচিন্তা

প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের সম্পর্ক কেমন চাই

–মো. আরিফুর রহমান*

সম্প্রতি মাধ্যমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণের একটা বড় আন্দোলন আমরা প্রত্যক্ষ করলাম। এই আন্দোলনকারী শিক্ষকেরা একটা হিসাব দিয়েছেন। সেখানে তারা দেখাচ্ছেন বাংলাদেশে মোট এমপিও-ভুক্ত কলেজের সংখ্যা ৪,০০৭টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৯,৮৪৮টি এবং মাদ্‌রাসার সংখ্যা ৯,৩৪১টি। কলেজ পর্যায়ে শিক্ষকের সংখ্যা ১,১৭,৩৩৭ জন, মাধ্যমিক পর্যায়ে ২,৪৩,৫৫৩ জন, মাদ্‌রাসায় ১,১৩,৩৬৮ জন এবং কারিগরিতে ৩২,৩৭৮ জন। এর বিপরীতে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী রয়েছে। আন্দোলনকারী শিক্ষকরা এই হিসাব দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে যে আয় হবে তার চেয়ে সরকারের কম ব্যয় হবে জাতীয়করণের ফলে। তারা বলতে চাচ্ছেন এতে সরকারের ক্ষতি হবে না; বরং লাভই থাকবে। আমি অবশ্য লাভক্ষতির হিসাবের জন্য এই তথ্যগুলো দিইনি। আমি দেখাতে চেয়েছি কী পরিমাণ শিক্ষক আমাদের রয়েছে, কতগুলো প্রতিষ্ঠান আমাদের রয়েছে। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে একজন করে প্রধান রয়েছেন এবং একজন করে সহকারী প্রধান থাকার কথা। অনেক জায়গায় সহকারী প্রধান নেই। বছরের পর বছর ধরে তার নিয়োগ হয় না। আবার ঠিক এর বিপরীত চিত্রও রয়েছে। বছরের পর বছর চলেছে সহকারী প্রধান শিক্ষক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন, যেকোনো ক্ষমতার জোরে তিনি প্রধান শিক্ষক নিয়োগে কালক্ষেপণ করছেন। আবার অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে প্রধান শিক্ষকও নেই, সহকারী প্রধান শিক্ষকও নেই। নানান রকম মামলা মকদ্দমায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা শোচনীয়। বছরে পর বছর ধরে এভাবে চলছে। সমস্যা কিন্তু ব্যক্তি প্রধান শিক্ষকের নয় বা ব্যক্তি সহকারী প্রধান শিক্ষকের নয়। সমস্যা হলো আমাদের সামগ্রিক পদ্ধতিতে, ব্যবস্থাপনায়। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাবান কারোর সাথে বা স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালীদের সাথে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সমস্যা। এই কারণে ঝুলে থাকে সহকারী প্রধান শিক্ষকের নিয়োগ। বাংলাদেশের এই রকম অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলোতে বৈধভাবে নিয়োগ পাওয়া প্রধান শিক্ষক বা সহকারী প্রধান শিক্ষক স্কুলে যেতে পারছেন না। এগুলো ক্ষমতার খেলা।

বাংলাদেশে এমপিও-ভুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৯১,৬০,৩৬৫ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর অনেকেই প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী প্রধান শিক্ষকের বা অন্যান্য শিক্ষকের মধ্যকার সমস্যার কারণে কোনো না কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। আমরা প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী প্রধান শিক্ষকের মধ্যে দ্বন্দ্ব চাই না। স্কুলের সাথে সংশ্লিষ্টদের মধ্য ভালো এবং ইতিবাচক সম্পর্ক চাই। রাজনৈতিক বা সামাজিক কোনো প্রকার ক্ষমতা বা দাপটের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় আমাদের চাওয়া তাই এবং এই কাজে সরকারের পাশাপাশি আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

আমি এ লেখাটিতে একটি গল্প বলতে চাই। দীর্ঘ দশবছর ধরে আমি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় কাজ করছি। এই সংস্থাটি শুধু মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে ২৫ বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছে। বছরের বিভিন্ন সময়ে দেশের নানা প্রান্তে কর্মসূচি বাস্তবায়নে আমি যাই। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কুমিল্লার মুরাদনগরের একটি স্কুলে গেলাম শিক্ষার্থীদের চরিত্রগঠন ও জীবনদক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের জন্য। এই স্কুলটি ছিল একটি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। প্রধান শিক্ষক অত্যন্ত আন্তরিক মানুষ। দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় আমি একাই প্রশিক্ষক ছিলাম। প্রধান শিক্ষক দুইজন সহকারী শিক্ষককে আমার সুবিধা অসুবিধা দেখার জন্য বলে রেখেছিলেন। তাঁরা মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীসহ আমার খোঁজখবর নিয়েছেন। আমি লক্ষ্য করলাম, অন্য শিক্ষকরা আমাদের প্রশিক্ষণের বিষয়ে কোনোরূপ আগ্রহ দেখাচ্ছেন না; বরং বিরক্তি ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাদের মধ্যে। প্রশিক্ষণ শেষ হলো অত্যন্ত সফলভাবে। শিক্ষার্থীরা চরিত্রগঠন, অভ্যাস পরিবর্তন, সমস্যা সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ নানান বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করলো। তাদের আগ্রহ আমার ভিতরে একটা ভালো লাগার দোল দিয়ে গেল।

স্কুল ছুটির দশ মিনিট আগে আমি স্কুলটির সব শিক্ষককে নিয়ে বসলাম। প্রথমেই বলে নিলাম আপনাদের সাথে মিটিং স্কুল ছুটির আগেই শেষ করবো। তবুও তাদের চেহারার দিকে তাকানো যাচ্ছে না। আজ প্রশিক্ষণ

* *আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ভলান্টিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন ফর বাংলাদেশ-এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার।*

কর্মশালায় শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষকদেরকেও ভালো খাবার সরবরাহ করা হয়েছে। আমি বুঝতে পারলাম খিদে লাগার কারণে এমনটি হয়নি। এই মিটিংয়ের মূল কথা ছিল আমাদের কার্যক্রমে সকল শিক্ষক যেন সম্পৃক্ত হন এবং প্রধান শিক্ষকের পাশাপাশি অন্য শিক্ষকবৃন্দও আমাদের সহযোগিতা করেন। মিটিং শেষ হলো স্কুল ছুটির পূর্বেই। প্রত্যন্ত গ্রামের এই স্কুলটির আশপাশে থাকার জন্য আবাসিক হোটেল না থাকায় প্রধান শিক্ষক আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। আমাকে থাকতে হবে কারণ আগামী দু'দিন এই অঞ্চলেই কাজ করা লাগবে। শেষ বিকালে প্রধান শিক্ষকের সাথে খোলামেলা আলোচনার সুযোগ পেলাম। এই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে আমি প্রধান শিক্ষকের নিকট জানতে চাইলাম, আপনার স্কুলের শিক্ষকরা মন মরা কেন? আমার প্রোগ্রামে তাদের আগ্রহী মনে হলো না, কারণ কী? প্রধান শিক্ষক বললেন, দুই একজন শিক্ষক বাদে সবাই আমার সমালোচনায় ব্যস্ত। কয়েকদিন আগে স্কুলের কেরানি টাকা আত্মসাৎ করেছিলেন। আমি তাকে শোকজ করেছি। আর টাকা পয়সা উঠানোর দায়িত্ব আমি নিজে নিয়েছি। এজন্য সে অন্য শিক্ষকদের সাথে জোট করে আমার বিরুদ্ধে লেগে থাকে। স্কুলের পিয়নও কেরানির সাথে তাল মেলায়। এখন কী করি আরিফ ভাই?

আমি ঐ প্রধান শিক্ষকের মূল বক্তব্যটা উপরে তুলে ধরেছি। এরপর তাঁর সাথে এ বিষয়ে অনেক কথা হলো। সে কথার মর্মার্থ, স্কুলে শিক্ষকদের ভিতরে একতা নেই। সুযোগ পেলেই একজন আর একজনের বিরুদ্ধে বিশেষ করে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে লেগে থাকে। সমালোচনা করে। আমি কয়েকটি কারণ খুঁজে পেলাম, স্কুলটি নন এমপিও; (এই লেখাটি যখন লিখছি স্কুলটি তখন এমপিও-ভুক্ত হয়ে গেছে) প্রধান শিক্ষক অন্যদের তুলনায় বেশি বেতন পান, স্কুলের কেরানি নিজ স্বার্থের জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে অন্য শিক্ষকদের সাথে নিয়ে প্রধান শিক্ষককে দমিয়ে রাখতে চান। যেহেতু স্কুলটি নন এমপিও তাই শিক্ষকরা আর্থিক অনিশ্চয়তায় ভোগেন এবং তাঁরা শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে অমনোযোগী। এই এলোমেলো অবস্থার ভিতরে স্কুলের পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে।

অনেক সময় শিক্ষকদের ভিতরকার কোন্দল শিক্ষার্থীরা জেনে ফেলে। স্কুলের শিক্ষকদের ভিতর সম্মিলিত ভিশন না থাকলে স্কুলের উন্নতি সম্ভব না। প্রধান শিক্ষক যেহেতু আমার নিকট জানতে চেয়েছেন কী করবেন এ অবস্থায় আমি তাঁকে বললাম, সহকারী শিক্ষকদের এবং আপনার বসার কক্ষ আলাদা কেন? একই কক্ষে বসলে সমস্যা কোথায়? আপনার স্কুলে তো শিক্ষার্থীদের বসার জায়গা দিতে পারেন না। একই কক্ষে বসলে একটা ক্লাসরুম বাড়বে এবং শিক্ষকদের সমালোচনার প্রবণতা কমবে। এক সাথে বসেন। সমস্যা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন। প্রধান শিক্ষক বললেন, আমরা আগে সেটাই করতাম। কয়েকজন শিক্ষক সেটা চাননি। আমি বললাম, সভাপতি মহোদয়ের সাথে আলোচনা করে এক কক্ষে বসার চেষ্টা করুন। দায়িত্ব ভাগ করে দিন। সব দায়িত্ব নিজের কাছে রাখার দরকার নেই। প্রধান শিক্ষক একমত পোষণ করলেন।

আর একটা গল্প শুনাই। বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের একটি স্কুল। খুব এলোমেলো অবস্থা। অভিযোগ রয়েছে, সাবেক প্রধান শিক্ষক লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে অযোগ্যদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে গেছেন। তাঁর সন্তান রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী এবং এই স্কুলের একজন জুনিয়র শিক্ষক। তিনি সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং কেরানির সাথে মিলে স্কুলে গ্রুপিং করেন। রাজনীতি করেন। শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে তার আগ্রহ নেই। এই শিক্ষককে বার বার শোকজ করেও কোনো লাভ হয়নি। রাজনৈতিক ক্ষমতায় তিনি পার পেয়ে যান। স্কুলটি একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে। সহকারী প্রধান শিক্ষকের বসার কক্ষ আলাদা। একদিন আমাকে বললেন, ভাই প্রধান শিক্ষকের অবস্থা খারাপ। যেকোনো সময় চাকরি চলে যেতে পারে তাঁর। একমাস পরে শুনলাম ঐ সহকারী প্রধান শিক্ষকই সাময়িকভাবে বরখাস্ত হয়েছেন। তাঁকে শোকজ করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, মরতে রাজি কিন্তু প্রধান শিক্ষকের কাছে নত স্বীকার করবেন না। প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধেও নানান অভিযোগ রয়েছে। তিনি রাজনীতি করেন। স্কুলে সময় দেন না। আমি এ প্রসঙ্গে আর একটি স্কুলের কথা বলতে চাই। স্কুলটি অনেক বড়। প্রধান শিক্ষক খুবই আন্তরিক। নতুন প্রধান শিক্ষক হয়েছেন। খুবই অ্যাকটিভ মানুষ। আমি লক্ষ্য করলাম, তিনি সব কাজ একা করতে চান। তাঁর সহাকারী প্রধান শিক্ষককে কোনো কাজেই ডাকতে চান না। পরামর্শ চান না। এতে করে দেখা যাচ্ছে, প্রধান শিক্ষকের কাজের চাপ বেড়ে যাচ্ছে। সময় মতো কাজ শেষ করতে পারছেন না। সহকারী প্রধান শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক একে অপরের সমালোচনা করেন। কখনো কখনো সেটা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সাথেও এক অপরের নেতিবাচক দিক নিয়ে আলোচনা করেন। *[৩৫ পৃষ্ঠায় দেখুন]*

কবিতা

গর্বিত স্বপ্নের এই ঠিকানায়

মোল্লা মাজেদ*

এ আমার অদম্য বিশ্বাস
চলমান গতির নিরীখে পাথর হয়ে যাক
সিক্ত রসের টই-টুম্বুর বেসাতি নিয়ে
ধাবমান পৃথিবী এগিয়ে যাক।

আমি তো পড়েই আছি এইখানে
স্বচ্ছ নীলাম্বরিতে আচ্ছাদিত হয়ে
গর্বিত স্বপ্নের এই ঠিকানায়
আর কিছু থাক বা না থাক
এ আমার লভ্যাংশের বর্ণালী অহংকার
চর্বিত লতায় থ্যাতলানো অবয়বে
নেতে পড়া কবিতাগুলো
অনাবাদি জমিন ছুঁয়ে
ফসলের উগ্র গন্ধ শুঁকে
নিঝুম ঘুমাক।

আমি তো চেয়েই আছি স্বর্ণালী স্বপ্নের দিগন্তে
কার্নিশে রূপালী জ্যোৎস্নার আলোক ছুঁয়ে
জেগে থাকা পল্লবী প্রান্তে মিলাক
আমার দিগ্বলয়ে পরিপূর্ণ পৃথিবীর
শেষ কিছু থাক বা না থাক
শুধু এ কবিতাগুলো স্বর্ণালী স্বপ্নের
গভীর অরণ্যে এসে ম্লান হয়ে যাক। ⁂

ওপারের যাত্রী

এম. এ মোমেন

দিন শেষ হয়ে গেলো,
হয়ে গেলো রাত্রী।
ওপারে যাবি নারে, ওপারের যাত্রী?
দেখ্ চেয়ে পশ্চিমে, দেখ্ চেয়ে দিনমনি-
হয়ে গেছে লালে লাল, ডুবে যাবে এক্ষুনি!
ত্বরা করে চল ঘরে,
দেরি কেন এত ওরে!
কেঁদে মরে ধাত্রী।
ওপারে যাবি নারে, ওপারের যাত্রী?

রাত শুধু রাতই নয়,
সাথে আছে ঝড়ের ভয়,
কালো মেঘে ছেয়ে আছে দিক-দিগন্ত
দেখ্ চেয়ে দেখ্ নারে, তুই কিরে অন্ধ?
ভুলে যা ক্ষণিকের মৈত্রী
ওপারে যাবি নারে, ওপারের যাত্রী?

ঢং ঢং বাজে তোর যাত্রার জয়ভেরী
এ ঘাটেই বাঁধা আছে ওপাড়ের খেয়া-তরী
মাঝি তার ধরে হাল,
বসে আছে কত কাল,
বসে আছে তোর সব, তোর সহযাত্রী।
ওপারে যাবি নারে, ওপারের যাত্রী?

যাত্রা পথে এ যে ভীষণ ডর্
নামে যদি সর্বনাশা ঝড়
শস্তির শ্বাস ফেলিসনা ঘাটে শুধু কিস্তি পেয়ে
যেতে হবে জলপথে উত্তাল তরঙ্গ বেয়ে
কত যে ডুবে গেল তোর মতো যাত্রী!
ওপারে যাবি নারে, ওপারের যাত্রী?

থালা-বাটি কম্বল, তল্পী-তল্পা যত তোর সম্বল
সাথে সব নিয়ে নে, নিয়ে নে ওরে-
ছাড়লে এ ঘাট কভু, এ ঘাটে আর আসবে না ফিরে
এ যে তোর জীবনের প্রলয় রাত্রী।
ওপারে যাবি নারে, ওপারের যাত্রী?

* *রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ি-৭৭২০।*

ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়ত ও শুব্বানের কর্মী সম্মেলন

গত ২১ জুলাই শুক্রবার ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়ত ও শুব্বানের যৌথ উদ্যোগে এক কর্মীসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জেলা জমঈয়ত সভাপতি মুহাম্মদ আব্দুল জলিল খানের সভাপতিত্বে বেলা ১১টায় জেলার কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদে প্রোগ্রাম শুরু হয়। শুরুতে দারসুল কুরআন পেশ করেন জলা জমঈয়তের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মুহা. ইসরাঈল হোসেন খান। অনুষ্ঠান উপস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক সম্পাদক মুহা. ইকরামুল হক। দারসুল হাদীস পেশ করেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া'র দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী মুহা. সাবিত বিন রশীদ।

জেলা জমঈয়ত ও শুব্বানের সাংগঠনিক কার্যক্রমকে বেগবান করার জন্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জেলা জমঈয়তের সভাপতি মুহা. আব্দুল জলিল খাঁন, সিনিয়র সহ-সভাপতি মুহা. ইসহাক আলী, সহ-সভাপতি মুহা. মিকাইল ইসলাম, সেক্রেটারি মুহা. আশরাফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহা. ইকরামুল হক, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহা. জহুরুল ইসলাম, তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা মুহা. আব্দুস সামাদ, তালীম ও তারবিয়াত বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহা. এমদাদুল হক, ঝিনাইদহ জেলা শুব্বানের সেক্রেটারি এ্যাডভোকেট ইহসানুল্লাহ বিন ডা. শাহাবুদ্দীন, হলিধানী ইলাকা জমঈয়তের সেক্রেটারি মাস্টার মুহা. ইবরাহীম খলীল, হলিধানী শাখা শুব্বানের সভাপতি মুহা. শাকিল আহমদ প্রমুখ। বাদ জুম'আহ্ ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দের পরামর্শক্রমে মুহা. সাবিত বিন রশীদকে সভাপতি এবং এ্যাডভোকেট ইহসানুল্লাহ বিন ডা. শাহাবুদ্দীনকে সেক্রেটারি করে ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীসের আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়। **কমিটির বিবরণ–** মুহাম্মদ সাবিত বিন রশীদ- সভাপতি, মো. শাকিল আহমদ- সহ-সভাপতি, এ্যাডভোকেট ইহসানুল্লাহ বিন ডা. শাহাবুদ্দীন- সাধারণ সম্পাদক, মো. রাকিব হাসান- যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ রেজওয়ান- কোষাধ্যক্ষ, মুহাম্মদগ হাসানুজ্জামান- সাংগঠনিক সম্পাদক, সাব্বির আহমদ- প্রচার সম্পাদক, মাহমুদ বিন ইকরাম- যুগ্ম প্রচার সম্পাদক, লিমন- সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পাদক, মুহা. সাকিব হাসান- সমাজকল্যাণ সম্পাদক, মঞ্জুরুল হক- প্রশিক্ষণ সম্পাদক, ইনজামুল হক- তথ্য গবেষণা সম্পাদক, মুহাম্মদ শাহরীয়ার- দপ্তর সম্পাদক, মো. মারুফ- পাঠাগার সম্পাদক, আব্দুল্লাহ- যুগ্ম পাঠাগার সম্পাদক।

খুলনা জেলা জমঈয়তের কর্মতৎপরতা

দাওয়াহ ও সাংগঠনিক কাজকে গতিশীল করতে খুলনা জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের নেতৃবৃন্দ জেলার বিভিন্ন এলাকা ও শাখায় সাংগঠনিক সফর করেন। গত ২৮ জুলাই শুক্রবার দিঘলিয়া এলাকার চন্দনীমহল শাখায় সফর করেন জেলা জমঈয়ত সভাপতি মাওলানা মো. জুলফিকার আলী। এতে উপস্থিত ছিলেন জেলা জমঈয়তের সহ-সভাপতি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, দিঘলিয়া এলাকা জমঈয়ত সেক্রেটারি মো. জিয়াউল হক এবং এলাকা জমঈয়তের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। জেলা সভাপতি জুমু'আর খুতবাহ্ প্রদান করেন। জুমু'আর সালাতান্তে শাখা জমঈয়ত সভাপতি মো. আবু হানিফ-এর সভাপতিত্বে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গত ১৮ আগস্ট শুক্রবার দিঘলিয়া এলাকার সেনহাটি বিদ্যাবাগিস পাড়া শাখায় সফর করেন জেলা জমঈয়তের সভাপতি মাওলানা মো. জুলফিকার আলী, সহ-সভাপতি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, সেক্রেটারি মো মইনুল ইসলাম প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন দিঘলিয়া এলাকা জমঈয়তের সেক্রেটারি মো. জিয়াউল হক-সহ এলাকা জমঈয়তের নেতৃবৃন্দ। জুমু'আর সালাতান্তে শাখা জমঈয়ত সভাপতি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উভয় সভায় জেলা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন।

বাগেরহাট সদর এলাকা জমঈয়তের কর্মতৎপরতা

গত ১১ আগস্ট শুক্রবার বাগেরহাট সদর এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীসের উদ্যোগে কোন্ডলা শাখা জমঈয়তে আহলে হাদীসের ১৯ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি গঠন উপলক্ষ্যে আয়োজিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন মো. আকবর আলী হাওলাদার। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভায় বাগেরহাট জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের জেনারেল সেক্রেটারি মো. আলতাফ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মাদ ইউসুফ আলী, এলাকার জমঈয়তের জেনারেল সেক্রেটারি মো. সাখাওয়াতুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক মো. আনোয়ার হোসেন-সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বক্তাগণ বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গঠনতন্ত্র মোতাবেক ১৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন। এরপর বিস্তারিত আলোচনা করে কোনডোলা জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব মুহাম্মদ রুহুল আমিনকে সভাপতি এবং মো. আনোয়ার শেখকে জেনারেল সেক্রেটারি করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি ঘোষণা করা হয়। সভা পরিচালনা করেন বাগেরহাট সদর এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহকারী সেক্রেটারি মো. লুৎফর হোসেন।

গত ১৮ আগস্ট শুক্রবার বাদ জুমু'আহ্ বাগেরহাট সদর এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীসের উদ্যোগে গোপালকাঠী শাখা জমঈয়তে আহলে হাদীসের ১৯ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন মো. আব্দুল মান্নান। মো. মোবাশ্বের আলীর কণ্ঠে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সভায় বাগেরহাট জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের জেনারেল সেক্রেটারি মো. আলতাফ হোসেন, সদর এলাকার জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি সৈয়দ রওনাকুল ইসলাম জেনারেল সেক্রেটারি মো. সাখাওয়াতুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক মো. আনোয়ার হোসেন, সদস্য মো. আলমগীর হোসেন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। জুমু'আর খুতবাহ্ ও সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন বাগেরহাট জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল এহসান। সভায় বক্তাগণ বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সদর এলাকার সভাপতি সৈয়দ রওনাকুল ইসলাম গঠনতন্ত্র মোতাবেক ১৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি প্রস্তাব পেশ করেন। এরপর গোটাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য মো. শাহ্ আলম বিপ্লবের উপস্থিতিতে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে মো. আব্দুল মান্নানকে সভাপতি এবং মো. একরামুল কবিরকে সেক্রেটারি করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি ঘোষণা করা হয়। এছাড়াও মো. শাহ্ আলম বিপ্লব সহ ০৫ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিশোধ গঠণ করা হয়।

গত ২৫ আগস্ট শুক্রবার বাদ জুমু'আহ্ বাগেরহাট সদর এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীসের উদ্যোগে কেশবপুর শাখা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন শাখা জমঈয়তের সভাপতি আব্দুল্লাহ আল নোমান। আলুকদিয়া শাখা শুব্বানের সদস্য মো. আবু তাহেরের কণ্ঠে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সভায় বাগেরহাট জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের জেনারেল সেক্রেটারি মো. আলতাফ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, সদর এলাকার জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি সৈয়দ রওনাকুল ইসলাম, জেনারেল সেক্রেটারি মো. সাখাওয়াতুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক মো. আনোয়ার হোসেন, দফতর সম্পাদক ইসহাক আলী, সদস্য মো. আলমগীর হোসেন, আনিসুর রহমান-সহ শাখা ও এলাকা জমঈয়তের নেতাকর্মী ও সুধীগণ উপস্থিত ছিলেন।

জামালপুরের ইসলামপুরে নব-নির্মিত মসজিদ উদ্বোধন

জামালপুর জেলার ইসলামপুর পৌরসভায় নবনির্মিত বায়তুন নূর জামে মসজিদের শুভ উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী খুতবাহ্ প্রদান করেন জামালপুর জেলা জমঈয়তের সভাপতি প্রফেসর ড. মোহাম্মদ জোবায়দুল ইসলাম। মসজিদ উদ্বোধন উপলক্ষে বাদ জুমু'আহ্ আলহাজ্জ মুহাম্মদ আব্দুর রহমান মাস্টারের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের ধর্মপ্রতিমন্ত্রী আলহাজ্জ মো. ফরিদুল হক খান দুলাল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এডভোকেট আব্দুস সালাম ও ইসলামপুর সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ ফরিদ উদ্দীন আহমদ।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ময়মনসিংহ জেলা জমঈয়তের সহ-সভাপতি মো. ফজলুল করিম ফারুকী, মসজিদ কমিটির সেক্রেটারি ডা. শামসুল আলম প্রমুখ। জুমু'আর সালাতের উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিবর্গসহ পাঁচশতাধিক মুসল্লি।

দু'আর আবেদন

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের উপদেষ্টা ও তাফসীর ইবনু কাসীরের অনুবাদ প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান বার্ধক্যজনিত গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসাধীন আছেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রফেসর ও চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন; বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী। প্রবাসে তিনি ইসলামের খিদমতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের পক্ষ থেকে তাঁর সুস্থতা কামনা করে দু'আর আবেদন করা হয়েছে।

মৃত্যু সংবাদ

০১. পাবনা জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের উপদেষ্টা ও সাবেক কার্যকরী সদস্য পরিষদের সদস্য আলহাজ্জ আলাউদ্দিন মিয়া গত ২৩ আগস্ট বাদ মাগরিব বার্ধক্যজনিত অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন- ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। জেলা জমঈয়তের পক্ষ থেকে সকল মুসলিমের কাছে মাইয়্যিতের জন্য মাগফিরাত কামনা করে, তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়েছে।

০২. বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের উপদেষ্টা প্রফেসর ড. আ.ব.ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকীর 'শাশুড়ি মা' খালেদা রহমান গত ২৪ আগস্ট, ফযরের সময়ে নিজ বাসভবন জামালপুরে ইন্তেকাল করেন- ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। পরিবারের পক্ষ থেকে সকল মুসলিমের কাছে মাইয়্যিতের জন্য মাগফিরাত কামনা করা হয়েছে।

শুব্বান সংবাদ

কেন্দ্রীয় শুব্বানের মাসিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহা. আব্দুল্লাহ আল- ফারুক এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ বিন হারিছের সঞ্চালনায় গত ২৫ অগাস্ট বাদ মাগরিব আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল কোরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ) মিলনায়তনে "'ইল্‌ম অর্জনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য" শীর্ষক মাসিক আলোচনা সভার ৩০তম পর্ব সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি ও জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক এবং প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সিনিয়র যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল ও সাপ্তাহিক আরাফাত-এর সম্পাদক শাইখ আবু আদেল মুহাম্মদ হারুন হুসাইন।

মামনীয় জমঈয়ত সভাপতি বলেন, শুব্বান তরুণদের নিয়ে গঠিত এমন একটি সংগঠন, যার প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর আল্লামা ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রাহিমাহুল্লাহ); যিনি সমগ্র বিশ্বের শিক্ষা জগতের একজন কিংবদন্তী ব্যক্তিত্ব।

তিনি ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ্ (রাহিমাহুল্লাহ)'র কথা উদ্ধৃত করে বলেন, পৃথিবীতে আল্লাহ ও রাসূলের পর সবচেয়ে সম্মানিত হচ্ছে আলেমগণ এবং আবু আল আসওয়াদ আদ-দুওয়ালি বলেন, বাদশাহগণ জনগণের উপরে কর্তৃত্ব খাটায় আর আলেমগণ বাদশাহগণের উপর কর্তৃত্ব খাটায়। তিনি আরও বলেন, 'ইল্‌মের সঠিক ব্যবহার হতে হবে, আলেমদের পদস্খলন দাজ্জালের চেয়ে ভয়ংকর। এক পর্যায়ে তিনি শুব্বানের নতুন দায়িত্বশীলদের অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

প্রধান আলোচক বলেন, 'ইল্‌ম এমন একটা শক্তি যার মাধ্যমে মহান আল্লাহকে চেনা ও জানা যায় এবং মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কর্ম নিবেদন করা যায়। মহান আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে আলেমগণই, যে সমস্ত আলেম 'ইল্‌ম অনুযায়ী 'আমল করবে না, তারা গাধার ন্যায়। উপকারী বিদ্যা হচ্ছে কুরআন সুন্নাহর বিদ্যা। কুরআন হাদীসের 'ইল্‌ম মানুষকে জাগরুক রাখে। 'ইল্‌ম এমন একটি সম্পদ যা মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে, 'ইল্‌ম এমন সম্পদ যা রাখার জন্য গোডাউনের প্রয়োজন হয় না।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের দফতর বিষয়ক সেক্রেটারি চৌধুরী মমিনুল ইসলাম, শুব্বানের সাবেক সভাপতি শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম, কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাহিত্য সাংস্কৃতিক সম্পাদক আবু লায়েছ ফাহিম, দফতর সম্পাদক হেদায়েতুল্লাহ, পাঠাগার সম্পাদক তাকিউদ্দীন, জুনিয়র অফিস সহকারী মো. আনোয়ার হোসাইন এবং স্থানীয় শাখা শুব্বানের নেতাকর্মীবৃন্দ।

মেহেরপুর জেলা শুব্বানের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

গত ২৬ আগস্ট শনিবার মেহেরপুর শহরের কলেজ মোড় মসজিদ কমপ্লেক্সে জেলা শুব্বানের সভাপতি মোস্তাফিজ রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম খানের সঞ্চালনায় মেহেরপুর জেলা শুব্বানের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। হাফেয সাজ্জাদুর রহমানের কণ্ঠে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাবেক দায়িত্বশীল ৩ নং কাজীপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মু. আলম হোসাইন, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ বিন হারিছ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জমঈয়তের সভাপতি ফখরুল ইসলাম, সেক্রেটারি শাইখ খালেদ সাইফুল্লাহ, কেন্দ্রীয় শুব্বানের দফতর সম্পাদক মুহাম্মদ হেদায়েতুল্লাহ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জমঈয়ত ও শুব্বানের দায়িত্বশীলবৃন্দ।

নেতৃবৃন্দের আলোচনার পর শুব্বানের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ বিন হারিছ নব-নির্বাচিত সভাপতি ও সেক্রেটারির নাম ঘোষণা করেন। সভাপতি ও সেক্রেটারি যথাক্রমে- আব্দুস সালাম খান ও জাহিদ হাসান। সবশেষে একটি সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনা পেশ করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি– আগামী তিনমাস কর্মীদের কাজের গতি ও কর্মদক্ষতা বিবেচনা করে একটি কর্মশালার আয়োজন করে ঐ কর্মশালায় পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হবে। সেই ক্ষেত্রে আরো নতুন ১০টি শাখা গঠন ও পুনর্গঠন, ১৭০ জনাকে রাগেব মানে, ২০ জনকে আরেফ মানে এবং ৬ জন সালেক মানে উন্নীতকরণের প্রস্তাবনা পেশ করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে জেলা জমঈয়তের নেতৃবৃন্দ সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন এবং কেন্দ্রীয় শুব্বানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

নারায়ণগঞ্জে শুব্বানের সুধী সমাবেশ ও কমিটি গঠন

গত ১৮ আগস্ট শুক্রবার, নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বানের উদ্যোগে কাঞ্চন এলাকার চরপাড়া জামে মাসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শুব্বানের সভাপতি আলিমুল্লাহ মিয়ার সভাপতিত্বে বাদ মাগরিব অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের প্রকাশনা বিষয়ক সেক্রেটারি ও নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি শাইখ অধ্যাপক ফজলুল বারী খান (মিয়া সাহেব) উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাঞ্চন পৌর এলাকা জমঈয়তের সভাপতি আলহাজ্জ আব্দুস সালাম।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের মিডিয়া বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ মাসউদুল আলম আল উমরী, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক শাইখ আব্দুল্লাহ বিন হারিছ, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারি শাইখ ইকবাল হাসান, দাওয়াহ ও তাবলীগ সম্পাদক শাইখ হাফেজ জুলফিকার আলী, চৌধুরীপাড়া ঈদগাহ'র ইমাম শাইখ খলিলউল্লাহ মোল্লা, জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত কারী শাইখ আব্দুল বারী প্রমুখ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়ত ও শুব্বানের নেতৃবৃন্দ।

এ সমাবেশে কেন্দ্রীয় শুব্বানের নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ বিন হারিছকে নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বানের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা প্রদান করেন চরপাড়া জামে মসজিদ শুব্বান শাখা কমিটি গঠন করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষপর্বে মোহাম্মদ রবিউস সানিকে সভাপতি ও দেলোয়ার হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক করে শুব্বানের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বানের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান মাদানী।

ময়মনসিংহ জেলা শুব্বানের কাউন্সিল

গত ২৭ জুলাই বৃহস্পতিবার, ময়মনসিংহ জেলা শুব্বানের কাউন্সিল কাতলাসেন কাদেরিয়া কামিল মাদ্‌রাসা মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শুব্বান সভাপতি এহসানুল হকের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হাফেয মো. শফিকুল হাসানের সঞ্চালনায় বাদ আসর অধিবেশন শুরু হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন আকিফ আল আহসান। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জেলা শুব্বানের সহ-সভাপতি হাফিজুর রহমান এবং সাংগঠনিক প্রতিবেদন পেশ করেন জেলা সেক্রেটারি মো. শফিকুল হাসান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ জেলা জমঈয়তের সভাপতি অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আতাউর রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা জমঈয়তের সহ-সভাপতি শাইখ আব্দুল্লাহ বিন সুরুজ, সেক্রেটারি শাইখ খোরশেদ আলম মাদানী, সাংগঠনিক সেক্রেটারি শাইখ আব্দুর রহমান মাদানী, শুব্বান বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ আব্দুর রাকিব মাদানী এবং ময়মনসিংহ শুব্বানের জোন প্রধান মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মোতি।

নেতৃবৃন্দের আলোচনার পর হাফেয মো. শফিকুল হাসানকে সভাপতি, দিদারুল ইসলামকে সেক্রেটারি করে ময়মনসিংহ জেলা শুব্বানের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়।

দিনাজপুর জেলা শুব্বানের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী

গত ২৪ আগস্ট বৃহস্পতিবার, জেলা শহরের কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস-দিনাজপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ইসলামিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

দিনাজপুর জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের আওতাধীন মাদরাসাসমূহের মধ্যে ৯টি মাদ্‌রাসার প্রায় পাঁচ শতাধিক প্রতিযোগী বাংলা, আরবি, হিফজুল কুরআন, ক্বিরাত, ইসলামী গজল ও শুব্বানের গঠনতন্ত্র থেকে কুইজ প্রতিযোগিতা সহ অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতা শুরু হয় সকাল ৯টা এবং বিকাল ৪টা পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

বাদ 'আসর দিনাজপুর জেলা শুব্বানের সাধারণ সম্পাদক হাফেয রাশেদুল ইসলামের সঞ্চালনায় কুরআন তিলাওয়াত ও ইসলামী সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী পর্ব শুরু হয়। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন দিনাজপুর জেলা শুব্বানের (ভারপ্রাপ্ত) সভাপতি মুহাম্মদ আব্দুর রহমান ইমরান মাদানী।

এতে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি হাফেয মাওলানা মোহাম্মদ আতিকুর রহমান বিন আবু তাহের বর্ধমানী। বিশেষ আলোচক হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারি শাইখ মোখতার হোসেন শেখ, দাওয়াহ ও তাবলীগ সম্পাদক শাইখ বাদীউজ্জামান মাদানী, তালিম ও তারবিয়াহ বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ নুরুল ইসলাম মাদানী, দিনাজপুর জোনের (শুব্বান) প্রধান শাইখ আহমাদুল্লাহ। কেন্দ্রীয় মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক হাফেয আশিক বিন আশরাফ।

এছাড়াও বক্তব্য পেশ করেন বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলবৃন্দ। অনুষ্ঠান শেষে দিনাজপুর জেলা শুব্বানের পক্ষ থেকে আমন্ত্রিত অতিথিদেরকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয় ও প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদ্'আত, প্রত্যেকটি বিদ্'আতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০১) : *পোশাক প্রদর্শনীর জন্য যে সকল মূর্তি বা শো-ডল ব্যবহার করা হয়। এরূপ করা বৈধ হবে কি?*

ইয়াকূব
ভুয়াপুর, টাঙ্গাইল।

জবাব : ইসলামে প্রাণীর মূর্তি, প্রতিকৃতি, ছবি, ভাস্কর্য তৈরি করা, বিক্রয় করা, প্রদর্শন করা, সংরক্ষণ করা হারাম; উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন। তবে যদি সেগুলোর মাথা কর্তন করা হয় বা মুখাবয়ব মুছে ফেলা হয় তাহলে তাতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ, ছবি/মূর্তির মূল হলো মাথা। তাই যদি মাথা না থাকে তবে তা গাছ বা জড় পদার্থের মতো হলো। এ সম্বন্ধে জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলেন :

فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِيْ فِي الْبَيْتِ يُقْطَعُ، فَيَصِيْرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ، وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ، فَلْيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مَنْبُوْذَتَيْنِ تُوْطَآنِ.

"আপনি মূর্তির মাথা কেটে দিতে বলেন, ফলে সেটা বৃক্ষ আকৃতিতে রূপান্তরিত হবে। আর পর্দার কাপড়কে দু' টুকরা করে তা দ্বারা দু'টি বালিশ বানাতে বলেন।" *(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৪১৫৮, সহীহ)*

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

«الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة».

"ছবি হলো মাথা। সুতরাং মাথা কেটে ফেলা হলে সেটা আর ছবি থাকল না।" *(সহীহুল জামে'- আলবানী, হা. ৩৮৬৪)*

এমন কর্তিত মস্তক মূর্তি বা ছবিতে পুরুষ বা মহিলাদের পোশাক ডিসপ্লে করা যেতে পারে। তবে শর্ত হলো, এর মাধ্যমে ইসলামে নিষিদ্ধ নোংরা ও বেহায়াপনামূলক পোশাক প্রদর্শন করা যাবে না বা সেগুলোতে যেন নারী বা পুরুষের এমন সব অঙ্গ ফুটে না থাকে যাতে বিপরীত লিঙ্গকে উত্তেজিত করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক্ব দানকারী।

জিজ্ঞাসা (০২) : *পুরুষরা হাতে বা নখে মেহেদী লাগালে কোনো গুনাহ হবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।*

রাসেদ আলম
উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।

জবাব : সৌন্দর্যের জন্য পুরুষদের হাতে-পায়ে মেহেদী ব্যবহার করা জায়িয নয়– *(ফাতহুল বারী- ইবনু হাজার, হা. ৫৮৯৯-এর ব্যাখ্যা দ্র.)*। কারণ মেহেদী এক ধরনের রঙ। আর পুরুষদের জন্য রঙ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, জেনে রাখো যে, পুরুষদের খোশবূ এমন, যাতে সুগন্ধি আছে রং নেই। পক্ষান্তরে নারীদের খোশবূ এমন, যাতে রং আছে সুগন্ধি নেই। *(সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ২৭৮৭, মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৪৪৪৩)*

এছাড়া তিনি পুরুষদের জন্য রঙ থাকার কারণে জাফরানের সুগন্ধি ব্যবহার করতেও নিষেধ করেছেন। *(বুখারী- হা. ৫৮৪৬; মুসলিম- হা. ২১০১; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৪৪৩৪)*

তবে চিকিৎসার প্রয়োজনে যে কোনো স্থানে মেহেদী ব্যবহার করা জায়িয আছে। *(সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ২০৫৪; সহীহুল জামে'- হা. ৪৬৭১; সহীহাহ্- হা. ২০৫৯)*

মাথার চুল ও দাড়িতে মেহেদী ব্যবহার করা উত্তম। *(আবূ দাঊদ; জামে' আত্ তিরমিযী; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৪৪৫১)*

জিজ্ঞাসা (০৩) : *আমার স্ত্রী প্রায়ই নযর-মানত মানে। কিন্তু কখনো কখনো তা আদায় করে না। এমতাবস্থায় কোনো গুনাহ হবে কি?*

আব্দুল্লাহ মতি
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

জবাব : নযর বা মানত করা কোনো উত্তম কাজ নয়। নবী (ﷺ) নযর বা মানত মানার বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরুৎসাহিত করে ইরশাদ করেছেন–

«إِنَّهُ لَا يَأْتِيْ بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ».

"নযর মানাতে কোনো কল্যাণ আসে না, তাতে কেবল কৃপনের কাছ থেকে ধন বের হয়ে যায়।" *(সহীহুল বুখারী- হা. ৬৬০৮, ৬৬৯২; সহীহ মুসলিম- হা. ১৬৪০)*

তবে মনে রাখতে হবে পাপের কাজের নযর বা মানত না করলে অবশ্যই ব্যক্তিকে তার মানত পূর্ণ করতে হবে, অন্যথায় সে গুনাহগার হবে। শাইখ ইবনু জাবরীন বলেন, "নযর পূর্ণ করা অত্যাবশ্যক।" *(শাইখ ইবনু জাবরীন- ফাতাওয়া আল মারআ, পৃ. ১৪৮-১৪৯)*

জিজ্ঞাসা (০৪) : *আমি ফজর/মাগরিব/ইশা অর্থাৎ- জাহ্‌রি সালাতে শরীক হলাম এমন অবস্থায় যে, ইমাম সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠের মাঝামাঝি অথবা শেষের দিকে গিয়ে পৌঁছেছেন। এমতাবস্থায় আমি আল্লাহু আকবার বলে*

সালাতে দণ্ডায়মান হওয়ার পর কি করব? আমি কি সূরা আল ফাতিহাহ্ পড়ব, না কি চুপ থেকে ইমামকে অনুসরণ করব?

আব্দুর রহমান, খোকসা, কুষ্টিয়া।

জবাব : সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠ করা ফরয। এটা ব্যতীত সালাত হবে না। রাসূল (ﷺ) বলেন :

«لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ».

"যে ব্যক্তি সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠ করে না, তার সালাত পূরা হবে না।" *(সহীহুল বুখারী- হা. ৭২৩, মা. শা., হা. ৭৫৬; সহীহ মুসলিম- হা. ৯০০, মা. শা., হা. ৩৪/৩৯৪)*

«مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ» ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ.

"যে ব্যক্তি সালাত আদায় করল, অথচ উম্মুল কুরআন তথা সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠ করল না, তার সালাত অসম্পূর্ণ। এ কথাটি ৩ বার বলে বললেন– সালাত পুরা হয়নি।" *(সহীহ মুসলিম- হা. ৩৮/৩৯৫)*

মুক্তাদীকে ইমামের পিছনে অবশ্যই সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠ করতে হবে। রাসূল (ﷺ)-এর পিছনে সাহাবায়ে কিরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) ক্বিরাত পড়লে তাঁদেরকে পরিস্কার করে নির্দেশ দিয়ে বলেন :

لَا تَفْعَلُوْا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا.

"তোমরা এমনটি করবে না, কেবল উম্মুল কুরআন তথা সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠ করবে। কেননা, যে এটা পাঠ করে না তার সালাত হয় না।" *(মুসনাদে আহমাদ- হা. ২২৬৭১; আস্ সুনান আস্ সুগরা- হা. ৫৩৪)*

সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠের আবশ্যকতা সম্পর্কে আরো বহু সহীহ ও বলিষ্ঠ হাদীস রয়েছে। তাই আপনি তাকবীরে তাহরিমার পর সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠ করে যথারীতি ইমামের অনুসরণ করে সালাত সম্পন্ন করুন!

জিজ্ঞাসা (০৫) : আমরা জানি যে, তিলাওয়াতে সাজদার নির্ধারিত দু'আ আছে। যদি কোনো ব্যক্তি ঐ দু'আ না জানে তাহলে তিলাওয়াতে সাজদায় কি পড়বে? মেহেরবানী করে সঠিক জবাব দানে ধন্য করবেন।

মো. আবূ জাফর
বুড়িচং, কুমিল্লা।

জবাব : তিলাওয়াতের সিজদায় পঠিত দু'আ হলো–

«سَجَدَ وَجْهِيْ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ».

এটি সুনানের কিতাবে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত হয়েছে। *(আবূ দাঊদ- হা. ১৪১৪; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৫৮০)* সনদে ইখতেলাফ থাকায় হাদীসটি য'ঈফ। তবে 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে অপর সূত্রে সালাতের সাজদায় পঠিত দু'আ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে, যা সহীহ। অতএব বলা যায় যে, উক্ত দু'আটি পাঠ করতে হবে– এমনটি জরুরী নয়; বরং সালাতের সাজদায় যে সকল তাসবীহ পড়া সহীহ সনদে প্রমাণিত, এর যে কোনো একটি পাঠ করলেই তিলাওয়াতে সাজদাহ্ আদায় হয়ে যাবে।

জিজ্ঞাসা (০৬) : আমি জানি যে, কা'বা ঘরের মধ্যে সাধারণ প্রবেশে নিষেধ? আমার প্রশ্ন হলো– কা'বা ঘরের মধ্যে কি রয়েছে।

মো. নজরুল ইসলাম
যশোর, কেশবপুর।

জবাব : কা'বা ঘর মুসলিমদের ক্বিবলা হওয়ায় এটিকে সামনে করে সালাত আদায় করতে হয়। সে জন্য এর ভিতরে ফরয সালাত আদায় করা অনেকে বৈধ মনে করেননি। তবে সুযোগ পেলে নফল সালাত আদায় করাতে কোনো আপত্তি নেই। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নির্দেশনা নিম্নরূপ :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ فَأُصَلِّيَ فِيْهِ فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِيَدِيْ فَأَدْخَلَنِيْ فِي الْحِجْرِ فَقَالَ صَلِّيْ فِي الْحِجْرِ إِذَا أَرَدْتِ دُخُوْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّمَا هُوَ قَطْعَةٌ مِنَ الْبَيْتِ.

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন : আমি মহান আল্লাহর ঘর কা'বায় প্রবেশ করে তাতে সালাত আদায় করতে চাইলাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার হাত ধরে হিজরে নিয়ে গেলেন এবং বললেন : এ হিজরে সালাত আদায় কর। যখন কা'বায় প্রবেশ করতে চাইবে, মনে রাখবে-এটি বাইতুল্লাহর একটি অংশ...– *(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ১৭৩৩)*। কেউ কেউ ফরয সালাত আদায় করার পক্ষেও অভিমত দিয়েছেন– *('মাজমূ'আ ফাতাওয়া- ইবনু বায, ১০/৪২২)*।

মূলতঃ সবার ক্বিবলাহ হওয়ায় এটি সংরক্ষিত। তাই উম্মাহের বৃহত্তর সার্থে এটিতে প্রবেশ উন্মুক্ত করা হয়নি। আর এর ভেতর কিছু সুগন্ধি রাখার পাত্র ও রাজকীয় উপঢৌকন রাখা আছে মাত্র।

জিজ্ঞাসা (০৭) : আমার এক দূর আত্মীয় তার স্ত্রী মারা যাওয়ার পর স্ত্রীর বোনকে ছলে বলে চাপ প্রয়োগ করে জবরদস্তিমূলকভাবে বিবাহ করে নেয়। এমতাবস্থায় এই বিবাহ বৈধ হবে কি?

কাবীরুল ইসলাম
গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা।

জবাব : বলপূর্বক কোনো নারীকে বিবাহ করা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾

"হে ঈমানদারগণ! বলপূর্বক তোমরা নারীদের অধিকারী হয়ে যাবে এটা তোমাদের জন্য বৈধ নয়।" *(সূরা আন্ নিসা : ১৯)*

সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত ব্যক্তির বিবাহ সঠিক হয়নি; বরং তা অবৈধ হয়েছে।

জিজ্ঞাসা (০৮) : ***আমরা এতদিন জেনেছি যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) ১২ রবিউল আউয়াল জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু বর্তমানে কেউ কেউ বলছেন– ৯ রবিউল আউয়াল রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্ম তারিখ। আসলে কোন্‌টি সঠিক? জানিয়ে এ সংক্রান্ত সন্দেহ দূর করতে সহায়তা করবেন।***

আরিফুল ইসলাম
নোয়াপাড়া, যশোর।

জবাব : আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর জন্ম তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে বিতর্ক আছে। মুসলিম জনপদের অধিকাংশের নিকট একথা প্রসিদ্ধ যে, ৫৭০ খ্রি. সোমবার সুবহে সাদিকের শুভক্ষণে তাঁর (ﷺ) জন্ম। জন্মের দিন সোমবার এ ব্যাপারে অধিকাংশের ঐক্যমত রয়েছে। তবে তারিখ নিয়ে মতভেদ আছে। সীরাত ইবনু হিশামের বর্ণনা মতে লোক সমাজে প্রচলিত যে, ১২ রবিউল আউয়াল তাঁর (ﷺ) জন্মদিন। কিন্তু সন, মাস ও বার ঠিক রেখে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদগণ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সেদিন ছিল ৯ রবিউল আউয়াল। আর এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত। *(আর্ রাহীকুল মাখতুম [আরবী]; দারুল মু'আয়্যেদ- রিয়াদ/৫৪)*

জিজ্ঞাসা (০৯) : ***আমরা অনেক সময় রাস্তাঘাটে সখের বশে যাদু দেখে থাকি। এরূপ কাজে কোনো গুনাহ হবে কি?***

আবুল মানসুর
মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা।

জবাব : ইসলামী শরিয়ায় যাদু দেখা ও শেখা বা শেখানো সবই হারাম– *(আল মুনতাকা- শাইখ সালিহ আল ফাওযান, ২/৫৯)*। পরকালে যাদের শাস্তি লাভ ও জান্নাতের কোনো অংশ নেই তারাই কেবল যাদু দেখা ও শেখায় মত্ত হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾

"আর তারা অবশ্যই অবগত আছে, যে ব্যক্তি যাদু অবলম্বন করে তার জন্য আখিরাতে সামান্যতমও কোনো অংশ নেই।" *(সূরা আল বাক্বারাহ : ১০২)*

সাতটি ধ্বংসত্মক জিনিস ও ভয়াবহ পাপের মধ্যে যাদু অন্যতম। *(সহীহুল বুখারী- হা. ২৭৬৬; সহীহ মুসলিম- হা. ৮৯)*

সুতরাং এটা স্পষ্ট হলো– যাদু দেখা, তা শিখা, সেটির আশ্রয় নেয়া সবই হারাম এবং কঠিনতর কঠিন গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। এতে জড়িতদের অবিলম্বে তাওবাহ্ করা জরুরী।

জিজ্ঞাসা (১০) : ***খত্বীব সাহেব মিম্বরে আরোহন করার পর মুয়াজ্জিন আযান দেবেন, না আযানের পর খত্বীব মিম্বরে উঠে বসবেন? বিষয়টি নিয়ে আমাদের মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে। কারণ, আমাদের মাসজিদে প্রায়ই খত্বীব সাহেব মিম্বরে উঠার আগেই মুয়াজ্জিন আযান দিয়ে দেন। এ বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সমাধান চাই।***

এ. ওয়াদুদ মোল্লা
কিষানগঞ্জ, ভারত।

জবাব : এ মাস'আলাটির সঠিক সমাধানে রাসূল (ﷺ)-এর 'আমল অবশ্যই লক্ষ্য করতে হবে। বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, রাসূল (ﷺ) মিম্বরে বসার পর তাঁর সম্মুখে মাসজিদের দরজা বরাবর দাঁড়িয়ে মুয়াজ্জিন আযান দিতেন। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৯১২; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৫১৬)*

এটিই সঠিক সুন্নাত। *(ফাতহুল বারী- ইমাম ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী, ২/৩৯৪)*

এর বিপরীতে খত্বীব সাহেব মিম্বরে আরোহনের আগে যদি মুয়াজ্জিন আযান দেন, তাহলে সেটি ভুল হবে এবং সুন্নাতের খিলাফ কার্য বলে বিবেচিত হবে। যদি মুয়াজ্জিনের আযানের শুরুতে খত্বীব সাহেব দ্রুত মিম্বরে উঠে বসে পড়েন, তাহলে এ আযান পুনরায় না দিলেও চলবে। তবে মুয়াজ্জিনকে এ বিষয়ে সতর্ক ও সাবধান করা উচিত। যেন এরূপ কাজের পুনরাবৃত্তি না ঘটে। পক্ষান্তরে খত্বীব সাহেব মিম্বরে উঠার আগেই যদি আযান শেষ হয়ে যায়, তাহলে প্রকাশ্য সুন্নাত বিরোধী হওয়ায় তা বাত্বিল বলে গণ্য হবে এবং খত্বীব সাহেব মিম্বরে উঠে বসার পর পুনারায় আযান দিতে হবে।

জিজ্ঞাসা (১১) : ***সাহু সাজদার প্রচলিত পদ্ধতি তথা তাশাহুদের পর ডান দিকে একবার সালাম ফিরানো এবং পুনরায় তাশাহুদ, দরুদ, দু'আ মাসূরা পড়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত কী? যদি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় তাহলে কেন এ পদ্ধতির অনুসরণ করা হয় না? আর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত না হলে এমন ইমামের পিছনে সালাত আদায়কালে আমাদের করণীয় কি?***

মো. মাযহারুল ইসলাম
সদর, জয়পুরহাট।

জবাব : প্রচলিত পদ্ধতিতে সালাতের ভুল জনিত কারণে তাশাহহুদের পর ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে সাহু সাজদাহ্ দিয়ে পুনঃ দরুদ ও দু'আ মাসূরা ইত্যাদি পরে সালাম ফিরানোর কোনো বিশুদ্ধ দলিল নেই; বরং সাহু সাজদার নিয়ম হলো– রাকআত কমবেশির সন্দেহে ন্যূনতমটি ধরে নিয়ে পূর্ণ করে, রুকূ'-সাজদাহ্ ভুল হলে তা সংশোধন করে নিয়ে। তাশাহহুদে বসতে ভুল হলে শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ, দরুদ, দু'আ মাসূরা পড়ে সালাম ফিরানোর পূর্বে সাহু সাজদাহ্ করতে হবে। *(বুখারী- হা. ১২৩০; মুসলিম- হা. ১২৯২)*

সালাত বেশি পড়ে ফেললে হাদীসের বিধান হলো– একদা নবী (ﷺ) পাঁচ রাকআত সালাত আদায় করে ফেলার পর অবগত হয়–

فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ.

তাতে তিনি সালাম ফিরানোর পর দু'টি সাজদাহ্ করলেন। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১২২৬)*

অনুরূপ ক্ষেত্রে তাশাহহুদ, দরুদ ও অন্যান্য দু'আ সমাপ্ত করে সালাম ফিরাবে, অতঃপর দু'টি সাজদাহ্ দিবে এবং পুনরায় সালাম ফিরাবে। *(সহীহ মুসলিম- হা. ১৩০২)*

জিজ্ঞাসা (১২) : হারাম মাল যেমন মদ, এলকহল ইত্যাদি বিক্রি করে টাকা উপার্জন করলে, তা বৈধ হবে কি? এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের হুকুম জানিয়ে বাধিত করবেন।

নুসরাত ইসলাম
বনানী, ঢাকা।

জবাব : আল্লাহ তা'আলা কোনো বস্তুকে হারাম করলে তার মূল্যও হারাম করেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

إِنَّ اللهَ تعالى إذا حَرَّمَ شَيئًا حَرَّمَ ثَمَنَه.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ যখন কোনো বস্তুকে হারাম করেন, তার মূল্যকেও হারাম করে দেন"– *(দারাকুত্বনী- হা. ২৮১৫, সহীহ)*। এটি নিজে বিক্রি করুন কিংবা কোনো অমুসলিম দ্বারা বিক্রি করান, তা সবই হারাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

«لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَبَاعُوْهَا، وَأَكَلُوْا أَثْمَانَهَا إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ».

"ইয়াহূদীদের প্রতি মহান আল্লাহর লানত। তাদের উপর চর্বি হারাম করা হয়েছিল। অথচ তারা তা বিক্রি করল এবং এর মূল্য ভক্ষণ করল। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বস্তুকে হারাম করেন, তখন তার মূল্যও হারাম করেন।" *(দেখুন : 'গায়াতুল মারাম ফী তাখরীজি আহাদিসিল হালা-লি ওয়াল হারাম'- আলবানী, হা. ৩১৮, সহীহ)*

জিজ্ঞাসা (১৩) : সমাজে প্রচলিত আছে যে, 'আব্দুল ক্বাদীর জ্বিলানী (রাহিমাহুল্লাহ) না-কি মায়ের পেট থেকে ১৮ পারা কুরআন মুখস্ত করে জন্মগ্রহণ করেন –একথা কতখানি সঠিক?

মো. আব্দুল্লাহ
পলাশ, নরসিংদী।

জবাব : এটি কুরআন বিরোধী বানোয়াট কথা। এরূপ বিশ্বাস অবান্তর ও নেহায়েত অন্যায়, যা ইসলামী শরিয়তে নিষিদ্ধ। আর বানিয়ে হাদীস বলার পরিণাম জাহান্নাম– *(সহীহুল বুখারী- হা. ৩৪৬১)*। মানুষ জ্ঞানহীন অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُوْنِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا﴾

"আর আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের পেট থেকে বের করে এনেছেন এমন অবস্থায় যে, তোমরা কোনো কিছু জানতে না"– *(সূরা আন্ নাহ্ল : ৭৮)*। অতএব, ১৮ পারা কুরআন মুখস্থ করে জন্ম নেবে, তা কখনো হতে পারে না। হে প্রশ্নকারী! মহান আল্লাহর চূড়ান্ত কথার পর আর কি কোনো বক্তব্যের অবকাশ থাকে? নিশ্চয়ই যারা দাবী করেন বা বক্তব্যে বলেন– 'আব্দুল ক্বাদীর জ্বিলানী (রাহিমাহুল্লাহ) আল কুরআনের ১৮ পারা মুখস্থ করে জন্মে ছিলেন, তা সর্বৈব মিথ্যা। আল্লাহ তা'আলা এ শ্রেণির অন্ধ ভক্তদের হিদায়াত দান করুন –আমীন।

জিজ্ঞাসা (১৪) : আমাদের সমাজে অনেককে দেখা যায়, তারা কোনো প্রসঙ্গে বলেন : আগে আল্লাহ তা'আলা পরে রাসূল –এরূপ বাক্য বলা যাবে কি? যদি বলতে কোনো আপত্তি থাকে, তাহলে সেটি কোন ধরনের অপরাধ বলে বিবেচিত হতে পারে?

নূরুল আম্বিয়া, ভবেরচর, মুন্সিগঞ্জ।

জবাব : উপরোল্লিখত বাক্য মূলতঃ তাওয়াক্কুল-এর জন্য বলা হয়। আর তাওয়াক্কুল কেবল মহান আল্লাহর উপর করতে হয়। তিনি ব্যতীত অন্যের উপর ভরসা বা তাওয়াক্কুল করা শির্ক– *(সূরা আ-লি 'ইমরান : ১২২)*। উল্লেখ্য যে, মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার পর তাঁর সৃষ্টির হাতে আছে এমন বিষয়ে তাদের উপর ভরসা করা দোষণীয় নয়। আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যেহেতু মহান আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ইহধাম ত্যাগ করে বারযাখী জগতে আছেন, তাই যেসব বিষয়ে স্রষ্টার উপর ভরসা করা যায়, সেসব বিষয়েও তাঁর (ﷺ) উপর তাওয়াক্কুল করা যাবে না। কাজেই আগে আল্লাহ তা'আলা পরে রাসূল বলা শির্কী বাক্য।

জিজ্ঞাসা (১৫) : জানাযার সালাতে ৩য় তাকবীরের পর হাদীসে বর্ণিত যে কোনো একটি দু'আ পড়ে সালাম ফিরাতে হয় বলে আমরা জানি। কোথাও কোথাও দেখি তৃতীয় তাকবীরের পর ২টি দু'আ পর পর পড়তে। এভাবে দু'টি দু'আ পড়া যাবে কি?

মোস্তাকিম আহাম্মেদ শাওন
কাহেশ্টুলী, ঢাকা।

জবাব : জানাযার ৩য় তাকবীরের পর সহীহ হাদীসে বর্ণিত দু'আসমূহের মধ্যে হতে একাধিক দু'আ মিলিয়ে পড়া জায়িয, কেননা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : "যখন তোমরা মৃত ব্যক্তির জন্য সালাত আদায় করবে, তখন তার জন্য দু'আকে বিশুদ্ধ চিত্তে পাঠ করো"– *(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৩১৯৯)*। ইমাম শওক্বানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : এর দ্বারা বুঝা যায়– কোনো একটি দু'আ খাস নয়; বরং সুন্নাহে বর্ণিত দু'আসমূহ হতে যা সম্ভব পাঠ করবে– *(নায়লুল আওতার- ৪/৭৯)*। এ ব্যাপারে প্রশস্ততা আছে। ❑

প্রচ্ছদ রচনা

বাইতুর রহমান গ্রান্ড মসজিদ

–আব্দুল মোহাইমেন সাআদ

এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের মাঝখানে অবস্থিত বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম জনসংখ্যার দেশ ইন্দোনেশিয়া। ভারত মহাসাগর তীরবর্তী ইন্দোনেশিয়ার আচেহ প্রদেশের রাজধানী বান্দা আচেহ শহরের ল্যান্ডমার্ক খ্যাত প্রাচীন মুঘল স্থাপত্য রীতিতে তৈরী স্থাপনা বাইতুর রহমান গ্রান্ড মসজিদ। উত্তাল মহাসাগরের করাল গ্রাস আর ডাচ ঔপনিবেশিকদের বর্ণণাতীত শোষণ ও আগ্রাসনের মুখে টিকে থাকা আচেহ অঞ্চলের মানুষের ধর্ম, সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিকতা, সংগ্রাম, শক্তিমত্তা ও জাতীয়তার প্রতীক এই মসজিদ। গ্র্যান্ড মসজিদটি ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান ইস্কানদার মুদার আমলে নির্মিত হয়েছিল। কেউ কেউ বলছেন যে আসল মসজিদটি তারও আগে ১২৯২ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দিন মাহমুদস্যাহ নির্মান করেছিলেন। ডাচ ইস্ট ইন্ডিজের ওপনিবেশিক প্রশাসন যখন ক্রাটনকে আক্রমণ করে তখন আচেনিজরা বাইতুর রহমান গ্র্যান্ড মসজিদ থেকে কেএনআইএলকে আক্রমণ করে তখন জ্বলন্ত আগুন মসজিদের ছাদে এসে পড়লে মসজিদটিতে আগুন ধরে যায়। জেনারেল ভ্যান সুইটেন স্থানীয় শাসকদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি মসজিদটি পুনর্নির্মাণ করবেন। ডাচরা আচেনিজদের রাগ কমাতে উপহার হিসাবে বাইতুর রহমান গ্রান্ড মসজিদকে পুনর্নির্মাণ করেন। অনেক আচেনিজ প্রাথমিকভাবে বাইতুর রহমান গ্রান্ড মসজিদে সালাত আদায় করতে অস্বীকার করেন কারণ এটি ডাচ "কাফের" দ্বারা নির্মিত হয়েছিল, যাদের বিরুদ্ধে তারা লড়াই করছিল। আজ অবশ্য মসজিদটি বান্দা আচেহের গর্বে পরিণত হয়েছে। প্রথম নির্মাণকাজ শুরু হয় ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে , প্রথম পাথরটি স্থাপন করেছিলেন টেংকু কাজী মালিকুল আদিল, যিনি এই মসজিদের প্রথম ইমাম হয়েছিলেন। আচেহের শেষ সুলতান মুহাম্মদ দাউদ সিয়াহর রাজত্বকালে ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ ডিসেম্বর এটির নির্মান কাজ সম্পন্ন হয়। প্রথমে মসজিদটিতে কেবল একটি গম্বুজ এবং একটি মিনার ছিল। অন্যান্য গম্বুজ এবং মিনারগুলো ১৯৩৫, ১৯৫৮ এবং ১৯৮২ সালে যুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে মসজিদে সাতটি গম্বুজ এবং বান্দা আচেহের সবচেয়ে বড় মিনারসহ সর্বোমোট আটটি মিনার রয়েছে। মসজিদটি মূলত ডাচ আর্কিটেক্ট জেরিট ক্রুইন্স ডিজাইন করেছিলেন। পরবর্তীতে এই নকশাটি এলপি লুইজকস রূপান্তর করেছিলেন, যিনি ঠিকাদার লী এ সির নির্মাণকাজও তদারকি করেছিলেন। মোগল পুনর্জীবন শৈলী দ্বারা গ্র্যান্ড গম্বুজ এবং মিনারগুলো নকশা করা হয়েছে। অন্যান্য কালো গম্বুজগুলো টাইলস হিসাবে শক্ত কাঠের দাদ দিয়ে নির্মিত। মসজিদের অভ্যন্তরটি মার্বেল সিঁড়ি, চীন থেকে আনা মেঝে, বেলজিয়াম থেকে আনা স্টেইনড কাচের জানালা, সুসজ্জিত কাঠের দরজা এবং অলঙ্কৃত ব্রোঞ্জের ঝুল দিয়ে সজ্জিত। বিল্ডিং-এর পাথর নেদারল্যান্ডস থেকে আনা হয়ে ছিল। ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দের ভূমিকম্প এবং ভারত মহাসগরে তৈরি হওয়া ভয়াবহ সুনামিতে দেয়ালের ফাটলগুলোর মতো ছোট ছোট ক্ষয়ক্ষতির ছাড়া বড় কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি মসজিদটির। ভূমিকম্প ৩৫ মিটার মিনারকে মূল ফটক থেকে সামান্য কাত করে দিয়ে ছিল। দুর্যোগের সময়, মসজিদটি বাস্তুচ্যুত হাজার হাজার মানুষের জন্য অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং মাত্র দু'সপ্তাহ পরে নামাযের জন্য পুনরায় খুলে দেয়া হয়েছে ঐতিহাসিক এই মসজিদটি। ❑

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

নিম্নবর্ণিত পদে জরুরি ভিত্তিতে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের নিকট হতে আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে।

ক্র.	পদের নাম	সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	বেতন
১.	অধ্যক্ষ	০১	দাওরায়ে হাদীসসহ এম.এ (ইসলামিক স্টাডিজ)/কামিল পাশ (মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বা আরব বিশ্ব থেকে ডিগ্রিধারীগণ অগ্রাধিকার পাবেন)	অধ্যক্ষ/ উপাধ্যক্ষ পদে ০১ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে (আরবী ভাষায় কথোপকথনে পারদর্শী হতে হবে)	আলোচনা সাপেক্ষে
২.	সহকারী শিক্ষক (আরবী)	০১	দাওরায়ে হাদীস ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকসহ স্নাতকোত্তর/কামিল	সংশ্লিষ্ট পদে কমপক্ষে ৩ বছর বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে	
৩.	সহকারী শিক্ষক (নূরানী)	০১	নূরানী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হাফেযে কুরআন	কমপক্ষে ১ বছর বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে	
৪.	অফিস সহকারী কাম হিসাব রক্ষক	০১	স্নাতক/ফাজিল/সমমান	কম্পিউটার চালনায় ও টাইপিং (বাংলা, ইংরেজী ও আরবী)-এ পারদর্শী হতে হবে	

আবেদনকারীকে অবশ্যই 'আক্বীদাহ্ ও 'আমলে পূর্ণ সালাফী মানহাযের অনুসারী হতে হবে। **আবেদন পত্র গ্রহণের শেষ তারিখ : ১০/০৯/২০২৩ ইং**

আবেদন পত্র প্রেরণের ঠিকানা : আলহাজ্জ মো. ফজলুল হক, সভাপতি, উমর বিন খাত্তাব (রা.) মডেল মাদ্‌রাসা

গ্রেটওয়াল সিটি, নলজানি, চান্দনা-চৌরাস্তা, গাজীপুর সদর, গাজীপুর। ✆ ০১৭১২-১৯৩৯৯২, ✉ umarbkm2009@gmail.com

সংযুক্তি : ক. জীবন বৃত্তান্ত, **খ.** এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, **গ.** জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, **ঘ.** সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের ফটোকপি, **ঙ.** ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক নাগরিকত্ব সনদপত্রের ফটোকপি। **বি.দ্র. প্রার্থী বাছাই ও নিয়োগের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।**

দৈনন্দিন সালাতের সময়সূচি

সেপ্টেম্বর

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	ঈশা
০১	০৪:১৮	০৫:৩৯	১১:৫৯	০৩:২৬	০৬:১৮	০৭:৪৮
০২	০৪:১৮	০৫:৪০	১১:৫৯	০৩:২৬	০৬:১৭	০৭:৪৭
০৩	০৪:১৯	০৫:৪০	১১:৫৯	০৩:২৫	০৬:১৬	০৭:৪৬
০ ৪	০৪:১৯	০৫:৪১	১১:৫৮	০৩:২৫	০৬:১৫	০৭:৪৫
০৫	০৪:২০	০৫:৪১	১১:৫৮	০৩:২৫	০৬:১৪	০৭:৪৪
০৬	০৪:২০	০৫:৪১	১১:৫৮	০৩:২৪	০৬:১৩	০৭:৪৩
০৭	০৪:২১	০৫:৪১	১১:৫৭	০৩:২৪	০৬:১২	০৭:৪২
০৮	০৪:২১	০৫:৪২	১১:৫৭	০৩:২৪	০৬:১১	০৭:৪১
০৯	০৪:২২	০৫:৪২	১১:৫৭	০৩:২৩	০৬:১০	০৭:৪০
১০	০৪:২২	০৫:৪২	১১:৫৬	০৩:২৩	০৬:০৮	০৭:৩৮
১১	০৪:২২	০৫:৪৩	১১:৫৬	০৩:২২	০৬:০৭	০৭:৩৭
১২	০৪:২৩	০৫:৪৩	১১:৫৬	০৩:২২	০৬:০৬	০৭:৩৬
১৩	০৪:২৩	০৫:৪৩	১১:৫৫	০৩:২২	০৬:০৫	০৭:৩৫
১৪	০৪:২৪	০৫:৪৪	১১:৫৫	০৩:২১	০৬:০৪	০৭:৩৪
১৫	০৪:২৪	০৫:৪৪	১১:৫৫	০৩:২১	০৬:০৩	০৭:৩৩
১৬	০৪:২৪	০৫:৪৪	১১:৫৪	০৩:২০	০৬:০২	০৭:৩২
১৭	০৪:২৫	০৫:৪৫	১১:৫৪	০৩:২০	০৬:০১	০৭:৩১
১৮	০৪:২৫	০৫:৪৫	১১:৫৪	০৩:১৯	০৬:০০	০৭:৩০
১৯	০৪:২৬	০৫:৪৫	১১:৫৩	০৩:১৯	০৫:৫৯	০৭:২৯
২০	০৪:২৬	০৫:৪৬	১১:৫৩	০৩:১৮	০৫:৫৮	০৭:২৮
২১	০৪:২৬	০৫:৪৬	১১:৫২	০৩:১৮	০৫:৫৭	০৭:২৭
২২	০৪:২৭	০৫:৪৬	১১:৫২	০৩:১৭	০৫:৫৬	০৭:২৬
২৩	০৪:২৭	০৫:৪৭	১১:৫২	০৩:১৭	০৫:৫৫	০৭:২৫
২৪	০৪:২৮	০৫:৪৭	১১:৫১	০৩:১৬	০৫:৫৪	০৭:২৪
২৫	০৪:২৮	০৫:৪৭	১১:৫১	০৩:১৬	০৫:৫৩	০৭:২৩
২৬	০৪:২৮	০৫:৪৮	১১:৫১	০৩:১৫	০৫:৫২	০৭:২২
২৭	০৪:২৯	০৫:৪৮	১১:৫০	০৩:১৪	০৫:৫১	০৭:২১
২৮	০৪:২৯	০৫:৪৮	১১:৫০	০৩:১৪	০৫:৫০	০৭:২০
২৯	০৪:৩০	০৫:৪৯	১১:৫০	০৩:১৩	০৫:৪৯	০৭:১৯
৩০	০৪:৩০	০৫:৪৯	১১:৪৯	০৩:১৩	০৫:৪৮	০৭:১৮